দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা



অধ্যাদেশ জারি করে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হোক
— পৃঃ ১৭

জম্মু ও কাশ্মীরের বিভাজনই রুখতে পারে সন্ত্রাসবাদকে
—পৃঃ ২৬



৭১ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ৪ মার্চ ২০১৯।। ১৯ ফাল্গুন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



বদলা চাই

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৯ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৪ মার্চ - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

দেশদ্রোহিতার নয়া নজির দ্বেষপ্রেমী আনন্দবাজারের ▯ অভিমন্যু গুহ ৬

খোলা চিঠি : সিবিআই তো আর ভূত নয় যে দিদি ভ্যানিশ করে দেবেন ▯ ৭

চোখ খোলবার সময় হয়েছে ▯ অনিল গুপ্ত ▯ ৮

পাকিস্তানের দ্রুত বিলয় ঘটুক ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১১

পাগলাও নিজের ভালো বোঝে, বাঙ্গালি বোঝে না ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১৩

নাগরিকত্ব বিলের ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি ▯ ১৫

অধ্যাদেশ জারি করে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হোক ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৭

ভারতের লড়াই দু-তরফেই ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

জম্মু ও কাশ্মীরের বিভাজনই রুখতে পারে পাক সন্ত্রাসবাদকে ▯ সনাতন রায় ▯ ২৬

যুদ্ধ নয়, আলোচনা চাই কিন্তু মধ্যস্থতা করবে কে? ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ২৮

মুক্তির উৎসব শিবরাত্রি ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

বাংলায় নাগরভজনের প্রবর্তক নরহরি সরকার ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৩

অস্তিত্বের সংকটে বাঙ্গালি হিন্দু ▯ নন্দদুলাল চৌধুরী ▯ ৩৫

সীমাপার পাকিস্তান পরে, আগে ঘরের পাকিস্তানের বিনাশ চাই ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ৩৮

সন্ত্রাসে বিনিয়োগ অনেক দেশের কাছে লাভজনক ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ৪০

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতি ▯ কেএন মণ্ডল ▯ ৪৩

পূজা ও জ্যোতিষ গণনা প্রাচীন পঞ্জিকামতে হওয়াই শাস্ত্রসম্মত ▯ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **কেরিয়ার গাইড : ২২** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **রঙ্গম : ৪৯** **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১১ মার্চ
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১১ মার্চ
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ধূলিসাৎ জইশ

পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার ঠিক বারোদিন পর চরম প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এমন এক প্রত্যাঘাত যার জন্য সারা দেশ অপেক্ষা করছিল। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে জইশ-এ-মহম্মদের তিনটি লঞ্চিং প্যাড সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। ধূলিসাৎ হয়েছে তাদের কন্ট্রোল রুম। নিহত অন্তত তিনশোরও বেশি উগ্রপন্থী। স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে উজ্জীবিত সারা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এন ডি এ সরকারকে নিয়ে আজ গর্বিত দেশের মানুষ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় ভারতের এয়ার সার্জিকাল স্ট্রাইক। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

এইবার পাকিস্তান সতর্ক হউক

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপর পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি বাহিনী যে হামলা সংঘটিত করিয়াছে এক কথায় তাহা যেমন কাপুরুষোচিত কাজ, তেমনই মানবতা বিরোধীও। কোনও দেশের নিরাপত্তারক্ষীদের পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আঘাত করিয়া যাহারা পলাইয়া যায়, বুঝাই যায়, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার মতো সাহস তাহাদের নাই। পাকিস্তান এবং তাহার মদতপুষ্ট জঙ্গি বাহিনী সেই রকমই কাপুরুষ। পাকিস্তান জানে সম্মুখ সমরে তাহারা ভারতকে পর্যুদস্ত কখনই করিতে পারিবে না। বরং, যখনই সম্মুখ সমর হইবে পরাজয়ই তাহাদের ভাগ্যে নাচিতেছে। ইতিপূর্বে যতবারই রণাঙ্গণে পাকিস্তান ভারতের সম্মুখীন হইয়াছে, ততবারই পাকিস্তানকে পরাজয়ের লজ্জা গাত্রে মাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে। তবুও, ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধে পাকিস্তান কখনও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত, মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করিয়া মহম্মদ আলি জিন্নাহ যেইদিন পাকিস্তান আদায় করিয়া লইয়া যান, তাহার পর হইতেই পাকিস্তান ভারতের সহিত ছায়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পড়ে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানি ফৌজ কাশ্মীরের একটি অংশ সমস্তরকম আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া দখল করিয়া বসে। সেই সময় ভারতীয় ফৌজ পাকিস্তানিদের কাশ্মীরের মাটি হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। বস্তুত, সেইদিনই পাকিস্তানিরা কাশ্মীরের বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিষবৃক্ষটি রোপণ করিয়া দিতে সফল হইয়াছিল। ইহার পরে নানাভাবেই কাশ্মীরের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছে পাকিস্তান। অকারণে ভারতীয় সীমানা বারে বারে লঙ্ঘন করিয়াছে পাকিস্তানি সেনারা। বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় সেনা এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের উপর গুলি বর্ষণ করিয়াছে তাহারা। নৃশংসভাবে ভারতীয় জওয়ানের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে তাহারা। নৃশংসতায় তাহারা যে জঙ্গিদেরই সমতুল্য তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। নৃশংস, মানবতাবিরোধী ইসলামিক জঙ্গিদের সহিত যে পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানি ফৌজের হৃদ্যতার সম্পর্ক, তাহাও প্রমাণ হইয়াছে জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারকে ওই দেশে নিরাপদ আশ্রয় দানের ভিতর দিয়া।

এতদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি সম্পর্কই বারেবারে স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা লইয়া সৌহার্দ্য বাসযাত্রা করিয়াছিলেন। পাকিস্তান সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। সৌহার্দ্য বাস যাত্রার প্রত্যুত্তর তাহারা দিয়াছিল কার্গিল হামলার মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এহেন পাকিস্তানকে ভারত কেন বিশ্বাস করিবে? কেনই বা আর তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাইবে? চোরা যে কখনও ধর্মের কাহিনি শুনে না, তাহা পাকিস্তান প্রমাণ করিয়াছে। পাকিস্তান ভাবিয়াছে, ভারতের সৌজন্যের অর্থ তাহার কাপুরুষতা। বারংবার রণাঙ্গণে ভারতের নিকট পর্যুদস্ত হইয়াও পাকিস্তান ইহা বুঝিতে পারিতেছে না যে, উপযুক্ত সময়ে ভারত প্রত্যাঘাত করিতে জানে। মঙ্গলবার ভোর রাত্রিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলির উপর বিমান হানা চালাইয়া ভারত বুঝাইয়া দিয়াছে, আর সহ্য করিতে সে রাজি নহে। পুলওয়ামা জঙ্গি হানার বারো দিবস পরে বারোটি যুদ্ধবিমান দ্বারা আঘাত হানিয়া ভারত ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছে পাকিস্তানকে যে কোনও মুহূর্তে গুঁড়াইয়া দিবার ক্ষমতা সে রাখে। ইহার পরেও যদি পাকিস্তান সতর্ক না হয়, তাহা হইলে অশেষ দুর্ভোগ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, এইটি সবে শুরু। ভারতের রুদ্ররূপ ক্রমশ প্রকাশ্য।

সুভাষিতম্

তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘনগর্জিবে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু।। (চাণক্যনীতি)

ভোজনে খুশি হন ব্রাহ্মণগণ। ময়ূর খুশি হয় মেঘের ডাক শুনে। সাধুগণ ঈশ্বরের করুণা পেলে খুশি হন। দুর্জনেরা খুশি হয় অন্যের বিপদ ঘটিয়ে।

দেশদ্রোহিতার নয়া নজির দ্বেষপ্রেমী আনন্দবাজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুলওয়ামা কাণ্ডের প্রতিবাদে অসহ্য ক্রোধে দেশবাসী গর্জে উঠে বলেছিল— 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'। এঁরা কোন রাজনৈতিক দলের আমরা সে খবর রাখি না, এঁরা কোন জাতের, এঁদের ধর্ম কী— সে খবরও আমাদের কাছে নেই। আমরা কেবল জানি, প্রতিবেশী দেশের শত্রুভাবাপন্ন আচরণের প্রতিবাদে আমাদের দেশের মানুষের এ হলো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। কিন্তু আনন্দবাজার প্রশ্ন তুলল— 'ওরা কারা?' যাঁরা স্লোগান তুলেছিলেন 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ', তাঁরা 'মুসলমান মুর্দাবাদ' বলেছেন এমন কথা আনন্দবাজার বলতে পারেনি। যদিও 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'কে 'মুসলমান মুর্দাবাদে'র সমার্থক করে দেখাতে আনন্দবাজারের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। এক মাননীয় কবি, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি হিসেবে যাঁকে মেলে ধরতে যাঁর ভক্তবৃন্দের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য, যিনি নিরুচ্চারে থাকতেই পছন্দ করেন, অন্তত তেমনটাই রটনা, যদিও রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা কিছু বিচিত্র। তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িকতা'র ইন্ধন ঠেকাতে অহরহ তিনি বাণী বিলোন, কাব্যিক বা অকাব্যিক সে যাই হোক না কেন। অথচ পুলওয়ামার ঘটনার পর তিনি অমন মূক হয়ে গেলেন কোন মন্ত্রবলে রাজ্যের স্বল্পবুদ্ধি মানুষ তা বুঝতে পারছেন না। নাকি তাঁর পেটোয়া সংবাদপত্রের লোকেরা কবিটির কামড় (বাইট) নিতেই ভুলে গিয়েছিল?

এক্ষেত্রে কবিকন্যার ভূমিকার প্রশংসা তো করতেই হয়। কারণ তিনি একই সঙ্গে কবি ও কবির তল্পিবাহক পত্রিকার মুখোশটা টেনে নামিয়েছেন। ইতিপূর্বে কবিকন্যাটি 'সাম্প্রদায়িকতা' রুখতে নানা ধরনের কেচ্ছা লিখেছেন। তবে পুলওয়ামা পরবর্তী উত্তর সম্পাদকীয়টি দুর্ধর্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি কাশ্মীরি 'জাতীয়তাবাদ'-এ ইন্ধন দেওয়ার পাশাপাশি মোক্ষম কথাটি বলে ফেলেছেন— 'জাতীয়তাবাদ' বলতে কাশ্মীরিরা কাশ্মীরই বোঝে, ভারত নয়।' লেখিকার অবশ্য এসব নিয়ে বিশেষ আক্ষেপ টাক্ষেপ নেই। মোদ্দা কথায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেনা মরে মরুক। এই মৃত্যু তাদের পেশাগত অধিকার। কিন্তু নিরীহ কাশ্মীরি বাদ দিন, পাথর ছোঁড়নেওলাদের জামাই আদরে রাখাটাই আমাদের 'অসাম্প্রদায়িক চরিত্র'। এই সম্পাদকীয়টি সকলেই পড়ে দেখতে পারেন, আনন্দবাজার নামক পত্রিকার চরিত্র ও আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যাবে। জে এন ইউ-তে আফজল গুরুর জন্মদিন পালন, গো-পাচার, শহুরে নকশালদের দেশে অরাজকতা সৃষ্টি, সর্বোপরি সেনা-নিধন যজ্ঞে নরেন্দ্র মোদীর কঠোর সমালোচককে এই পত্রিকাটির দ্বেষপ্রেমী ভাবনা যারপরনাই পরিস্ফুট হয়ে যাবে ওই একটি মাত্র সম্পাদকীয়তেই।

জে এন ইউ কাণ্ডের পরে 'ভারতমাতা' শব্দের প্রবল অপক্ষপাতী এক অর্বাচীন গায়ক 'মা যদি ভুল করে, তবে মা-কে জুতো মারব না কেন' গোছের একটি বালখিল্য সম্পাদকীয় লিখে, আনন্দবাজারের বর্তমান দেশদ্রোহী চরিত্রটি একেবারে সামনে এনে ফেলেছিল।

বর্তমান আনন্দবাজার পত্রিকাকে কেবল হিন্দুবিদ্বেষী ইত্যাদি বললে বিষয়টি লঘু হয়ে যায়, পাকিস্তানের দালালিই এদের একমাত্র লক্ষ্য। খেয়াল করে দেখুন গত বিধানসভা নির্বাচনে এদের দুর্ধর্ষ তৃণমূল বিরোধিতা এক লহমায় মমতা-আনুগত্যে পরিণত হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী সেনার বিরুদ্ধে বলায়।

বর্তমান আবহাওয়ায় গায়কটি বিশেষ ট্যাঁ ফো করছেন না বটে, যদিও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা পত্রিকাটির দেশদ্রোহী চরিত্রকেই একেবারে বেআব্রু করে দিয়েছে। আলাদা করে সম্পাদকের কথা বলতেই হয়। মালিকপক্ষের গণ্ডগোলে আর লোভ- লালসায় তাঁর সম্পাদক হওয়ার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে বটে, তবে পূর্বতন বে-'সরকারি' স্বনামধন্য সম্পাদকদের মনে রাখলে, তাঁদের পাশে এই 'বেচারি'টিকে দেখলে, নিতান্ত এক নকশাল ক্যাডারকে সমবেদনা জানাতেই ইচ্ছা করে।

নকশালদের যে আলাদা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রয়েছে, শত ঝড়ঝাপটাতেও তা যে অটুট থাকে; বরং অতিরিক্ত তেল মেরে নকশালি ভাবনার প্রতিফলনে পত্রিকার পাতা অবিরত মুখরিত করলেই যে নকশালি নেটওয়ার্কে ঠাঁই মেলে না, দিল্লির ঘোষাল মশাই একেবারে হাতে-কলমে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। সম্পাদককে গ্যালন গ্যালন তেল মেরেও শেষে কিনা পদত্যাগ করতে হলো তাঁকে! তাই আজ স্পষ্ট ভাষায় একটা কথা বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে যে এই সেই আনন্দবাজার, যার সঙ্গে অতীতের জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমী আনন্দবাজার পত্রিকার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর লেখা 'বন্দে মাতরম্', এখন তাদের দ্বারাই যেভাবে প্রতিপদে অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে তাতে আনন্দবাজারের পূর্বপুরুষের আত্মা তাঁদের বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে বিযুক্ত হতেই চাইবেন।

কমিউনিস্ট মতাদর্শ পরাধীন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের গোলামে পরিণত করতে চেয়েছিল। নকশালি, মাওবাদী মতাদর্শ স্বাধীন ভারতবর্ষকে পররাষ্ট্রে পদানত করতে চায়, চীন আর তারপর পাকিস্তানই এদের সবচেয়ে পছন্দ। তাই বর্তমান আনন্দবাজার পত্রিকাকে কেবল হিন্দুবিদ্বেষী ইত্যাদি বললে বিষয়টি লঘু হয়ে যায়, পাকিস্তানের দালালিই এদের একমাত্র লক্ষ্য। খেয়াল করে দেখুন গত বিধানসভা নির্বাচনে এদের দুর্ধর্ষ তৃণমূল বিরোধিতা এক লহমায় মমতা-আনুগত্যে পরিণত হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী সেনার বিরুদ্ধে বলায়। খোদ সম্পাদক তো জোর গলায় বলেই দিয়েছেন 'দেশদ্রোহী' তকমা মোদীর আমলে নাকি রীতিমতো গৌরবের বিষয়। তাই পাঠক বুঝে নিন, মোদী বিরোধিতা, বিজেপির বিরোধিতা বা আর এস এস বিদ্বেষের আড়ালে দেশদ্রোহিতাই এই পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ■

সিবিআই তো আর ভূত নয় যে দিদি ভ্যানিশ করে দেবেন

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আমাদের দিদি মানে মুখ্যমন্ত্রী 'পদ্মাবত' সিনেমা নিয়ে মুখ খোলেন কিন্তু ভবিষ্যতের ভূত নিয়ে নয়। একটি সিনেমা নিয়ে দিদি অসহিষ্ণুতাকে রাগ দেখান আর অন্য একটি নিয়ে নিজেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। এটাই ওনার ধর্ম। বরাবর তিনি সবেতে আছেন। যখন যেটা দরকার। তার দলও তাই। তিনি সিবিআইকে এই রাজ্যে ঢুকতে দেবেন না বলেছেন। কিন্তু সারদা থেকে তো মুক্তির উপায় নেই। এতদিন প্রশ্ন ছিল সারদার মতো চিটফান্ড থেকে টাকা নিয়েছে তার দল। এখন সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই নতুন প্রশ্ন তুলেছে। সারদাকর্তা জেলে যাওয়ার পরে সুদীপ্ত সেনের কোম্পানি চালিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের মাসের পর মাস কোটি কোটি টাকা বেতন দিয়েছেন। অন্য খরচও মিটিয়েছেন কোম্পানির।

হিসেব বলছে, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতি মাসে ২৭ লাখ টাকা করে ২৩ মাস টাকা দেওয়া হয়েছিল সারদা কর্তার মালিকানাধীন তারা টিভিকে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬ কোটি ২১ লাখ টাকা। সিবিআই দাবি করেছে, তাঁদের তদন্তে উঠে এসেছে—সারদা কর্তা গ্রেফতার হওয়ার পরে, ২০১৩ সালের মে মাস থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২৩ মাস ধরে সারদা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন তারা টিভির কর্মীদের বেতন বাবদ এই টাকা খরচ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে।

সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হলফনামায় সারদা-সহ অন্যান্য চিটফান্ডের তদন্তের দায়িত্বে থাকা গোয়েন্দারা দাবি করেছেন, ওই লেনদেনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে চিটফান্ডের সঙ্গে রাজ্যের প্রভাবশালীদের যোগসূত্র। ওই আর্থিক লেনদেনের তথ্য উঠে আসার পরেই রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে ১৬ অক্টোবর ২০১৮ সালে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়, কার নির্দেশে এবং কীভাবে ওই টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সরকারি কোষাগার থেকে। সিবিআইয়ের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত তার কোনও উত্তর তারা পায়নি। কিন্তু অত প্রশ্নের কী রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তো প্রকাশ্যেই সেই সময়ে টাকা দেওয়ার কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন।

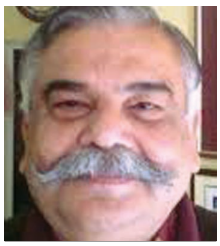
তারা টেলিভিশনের বিতর্ক তো রয়েইছে, এর উপরে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগো বাংলার অ্যাকাউন্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি নিয়েও নয়া বিতর্ক উঠে এসেছে। দিদি বলবেন, ভোটের মুখে এসব প্রশ্ন উঠছে কেন। কিন্তু প্রশ্ন কখন উঠলো তার থেকেও বড় কথা প্রশ্নটা কী। সিবিআই তদন্তে পেয়েছে, প্রায় সাড়ে ছ'কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি বিক্রি হয়েছিল। যার বড় অংশই আবার কিনেছেন বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার ডিরেক্টর, মালিকরা। সিবিআইয়ের বক্তব্য, চিটফান্ডের বিরুদ্ধে তদন্ত এড়াতেই ওই ছবি কেনা হয়েছিল। এটা অবশ্য রাজ্যের সব মানুষেরই বক্তব্য।

দিদির চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। বাড়বেই তো। সিবিআই হলফনামার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সমস্ত নথি জমা দিয়েছে। যা প্রমাণ করে রাজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে চিটফান্ড তদন্তে সিবিআইকে অসহযোগিতা করছে। তদন্তে অত্যন্ত প্রভাবশালীর সঙ্গে ওই চিটফান্ড কাণ্ডের যোগ পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয়ত, সিবিআইকে হেনস্থা করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন মামলা করেছে রাজ্য পুলিশ। সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া কলকাতার নগরপাল রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে যাওয়ায় কীভাবে কলকাতা পুলিশের হাতে সিবিআইকে 'হেনস্থা' হতে হয়েছিল, তা গোটা দেশ দেখেছে। অভিযুক্তদের বাঁচাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসেছেন। ভোটের সময়েও চলবে সেই মামলা। আটকাতে পারবেন না দিদি। সুতরাং দিদি কষ্টে আছেন। চিন্তায় আছেন। ভূতের ভবিষ্যৎ কী হবে কেউ জানে না কিন্তু ভবিষ্যতের ভূত তাড়া করছে দিদিকে।

— **সুন্দর মৌলিক**

চোখ খোলবার সময় হয়েছে

অতিথি কলম



অনিল গুপ্ত

সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তান ও অতঙ্কবাদীদের যৌথ উদ্যোগে যে নৃশংস আত্মঘাতী হামলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৪ জন জওয়ান নিহত হলো, তা নিয়ে ভারত-সহ গোটা বিশ্ব আজ বেদনাহত ও সন্ত্রস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পূর্বাপর বিশ্লেষণটি নির্দিষ্ট উদাহরণ-সহ এখানে রাখছি।

কাশ্মীরে জিহাদি হিংসা নতুন নয়। কিছুদিন আগে ২২ বছরের তরুণী ঈশ্বর মুনীর ভাটকে খুন করার পর সেটিকে মান্যতা দেওয়ার যে চেষ্টা হলো তা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষাবলম্বনকারীদের মাথা নত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

দীর্ঘদিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীর প্রচার মাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। একটি অতি সাম্প্রতিক ভয়ংকর ও বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরও দিল্লির তথাকথিত 'লুটিয়েন্স মিডিয়াকে' সভ্য করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কাশ্মীরিরা লজ্জায় তাদের মাথা নত হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। আতঙ্কবাদীদের সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ১০ সেকেন্ডের ভিডিও মানুষকে হতভম্ব করে দিয়েছে। ভিডিওতে একটি তরুণী বারবার প্রাণভিক্ষা চাওয়া সত্ত্বেও জেহাদিরা হাত ধরা দূরত্ব থেকে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে গুলি করে মারছে। আর একবার নয়, তারা গুলি করছে বারবার। চলে যাওয়ার আগে তারা মৃত মেয়েটির পাশে তাকে নিরাপত্তা বাহিনীর চর হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি চিঠি রেখে যায়।

এই ধরনের মিথ্যা অজুহাত জিহাদিরা নিজেদের ঘৃণ্যতম কৃতকর্মের সমর্থনে সর্বদাই দিয়ে থাকে। এই ধরনের খুন ও পরবর্তীকালে তার ভিডিও প্রকাশ অতীতেও বহুবার হয়েছে। তবে এই প্রথম কোনো নিরস্ত্র মহিলাকে বলি হতে দেখা গেল। এ যাবৎ কাশ্মীরি মেয়েরা নির্বিচারে জিহাদিদের লালসার শিকার হয়ে আসলেও তারা নীরব থেকেছে। এক্ষেত্রে তাদের বীরপুঙ্গব স্বামীদের বাজারি 'ইজ্জত' না হলে যে অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

সাম্প্রতিক এই বিকৃত মানসিকতার অপরাধ নৃশংসতা ও হিংস্রতার নিরিখে ২০০৯ সালের 'সোপিয়ান' ২০১৮ সালে ঘটা 'রসনার' অপরাধকে ছাড়িয়ে গেছে। অতীতে দুটি ক্ষেত্রেই সর্বভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি মিডিয়ার মাধ্যমে বিচার বা পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে দেশকে আজা-মৌজ বোঝাবার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি।

লক্ষ্য করার বিষয় এই, সাম্প্রতিকতম অপরাধটি নিয়ে মিডিয়ার সম্পূর্ণ বোবার ভূমিকায় অভিনয়, যেমন অস্বস্তিকর তেমনি হতবুদ্ধিকর। প্রশ্ন জাগে প্রচার মাধ্যমের এক আধটা ছাড়া এই ধরনের বাছাইকরা ক্ষেত্রে লম্ফঝম্ফ করা, অথচ নিশ্চিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সোচ্চার না হওয়াটা কি সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে?

> **"কাশ্মীরি মেয়েরা সন্ত্রাসবাদীদের লাম্পট্য, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, জবরদস্তি শাদি করা আর যখন খুশি তালাক দেওয়ার মতো বিকৃত কাজকর্মের সহজলভ্য শিকার। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত বহু তরুণীকে তারা নিজেদের লালসার বলি করে।"**

সূত্র অনুযায়ী নিহত মহিলাটি সম্প্রতি নিকেশ হয়ে যাওয়া ভয়ংকর জেহাদি জিনত উল ইসলামের আত্মীয়া। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী খুনের কয়েক দিন আগেই তাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। আশ্চর্যের কথা, বাড়ির লোকজন এই অপহরণের কথা স্থানীয় থানায় আদৌ জানায়নি। আর একটি বিষয়ও কাশ্মীরিরা অপমানে, দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তা হলো— যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা মারা গেলে হাজার হাজার মানুষ শবযাত্রায় শামিল হয় এই হতভাগ্য মেয়েটির ক্ষেত্রে এই শবযাত্রা ছিল নিঃশব্দ। সমগ্র জাতিরই এই মৃত্যুতে শোক অনুভব করার কথা থাকলেও বাস্তবে কিছুই ঘটেনি। সাধারণ নাগরিককে খুন করতে পারলে 'স্বর্গে যাওয়া (জন্নত)' যাবে জিহাদিদের এই দৃঢ় সংস্কার কেবল কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই বরাবর আবদ্ধ থাকবে না, এটা ভাবলে বাকি ভারত ভুল করবে।

বিস্ময়করভাবে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা অতীতের 'রসানার' ঘটনার ক্ষেত্রে লম্বা চওড়া বক্তব্য রাখার সঙ্গে মোমবাতি মিছিল করেছিলেন, তাদের কেউই একটি নিরীহ মেয়ের এমন হিংস্রতম খুনের কোনো নিন্দা পর্যন্ত করেননি।

সেই সমস্ত ড্রইংরুম বিলাসি জিহাদি সমব্যথীরা বরাবর বলে আসছে যে, কাশ্মীরের সশস্ত্র সন্ত্রাস আদতে আদৌ সন্ত্রাস নয়, তাদের কিন্তু আবার ভাবতে বলছি। তাদের মত অনুযায়ী কাশ্মীরের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি বহু আপাত বিরোধী ঘটনার জন্য কাশ্মীরিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিল্লির

থেকে যোজন ফারাকের। দু'টি কখনই মিলতে পারে না।

রাজনৈতিকভাবে ভিন্নতা অর্থে একধরনের স্বাতন্ত্র্যবাদ সেই স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৩০ থেকেই এখানে লালিত হয়ে আসছে। সেই অর্থে কাশ্মীরি রাজনীতি বরাবরই শেখ আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্সের অভিভাবকত্বে পরিচালিত। যে রাজনীতি চরিত্রগতভাবে নিতান্তই সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, এমনকি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভিত্তিক। এই ক্ষমতাভোগীরা মানতেই চান না যে সমগ্র কাশ্মীরবাসীর আশা- আকাঙ্ক্ষা আরও দুটি অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত, যা হলো জম্মু ও লাদাখ। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ অবলম্বনকারীরা নির্দ্বিধায় এড়িয়ে যান যে কেবলমাত্র কাশ্মীরি বলা সমগ্র জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বাসনা চরিতার্থ করতে যে সন্ত্রাসবাদের বাড়-বাড়ন্ত তা কিন্তু অন্য দুটি অঞ্চলের অকাশ্মীরি জনগণের নিদারুণ ক্ষতি করছে।

আজকের কাশ্মীরি সমাজ সন্ত্রাসবাদীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কখনই জিহাদিদের নিরন্তর হিংসার নিন্দা করেনি। অথচ তারা এটা জানে যে এই জেহাদের অন্তরালে উপত্যকায় একটি মৌলবাদী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত হচ্ছে। কর্মরত পুলিশ আধিকারিক বা পরিবারের সদস্যদের হত্যা, ছুটিতে বাড়ি যাওয়া সৈনিক, নিরীহ তরুণ, জাতীয়তাবাদী কর্মী, বিভিন্ন পেশায় জড়িত নাগরিক বা সাংবাদিকদের নির্বিচার হত্যা, তারা স্বধর্মীয় হলেও সুশীল সমাজ বা গর্বিত নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশিত প্রতিবাদ কোনোদিন শোনা যায়নি। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না এই সন্ত্রাসবাদীরাও কিন্তু নাগরিক সমর্থন ব্যতিত দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারে না। অপরাধীদের যারা সমর্থক তারাও অপরাধীদের মতোই সমান দায়ী।

প্রখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞ নীরব ভাটনগর বলেছিলেন, যে সমাজ নির্বিচার হিংসার সমর্থন করে নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়, তারা কিন্তু নিজের অজান্তেই এক সময় এমন একটা অদৃশ্য জালে জড়িয়ে যায় যেখান থেকে ভবিষ্যতে তারা আর বেরোতে পারে না। এই জাল যখন একবার বোনা হয়ে যায় তখন কী সাধারণ মানুষ, কী সন্ত্রাসী, কী রাজনীতিক সকলেই একটা সময় এতে অন্তরীণ হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, মৌলানা, সন্ত্রাসবাদী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, মিডিয়া, বিদেশি শক্তি, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সকলেই এক যোগে এই জালে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা তাদের সকলেরই নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার থাকে। স্বার্থ চরিতার্থ করার একমুখী প্রকল্পে স্থির থাকায় তারা জনতার ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার গ্রাহ্যই করে না। জনতার বড়ো অংশ জ্ঞানে অজ্ঞানে অংশীদার হয়ে যাওয়ার ফলে এক সময় জঙ্গিরাও এই জালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বস্তুত তারা এটিকে নিজ সুবিধার্থে হাইজ্যাক করে নেয়। আর এরই মাধ্যমে ছড়াতে থাকে মৌলবাদী ইসলামের বিষ।

আগেই বলা হয়েছে ঢালাও হিংসা ছড়ানো ছাড়াও জিহাদিরা কাশ্মীরি মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেও অভ্যস্ত। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অঙ্গ key pad-এর চল কাশ্মীরে খুব বেশি। দেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় কাশ্মীরিদের অংশগ্রহণ জনসংখ্যার অনুপাতে বিশাল। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিরাপত্তারক্ষীদের জিহাদিদের ওপর অত্যাচারের অসংখ্য জাল ভিডিও নেট ছেয়ে থাকে। কিন্তু নিরীহ মেয়েদের ওপর জিহাদিদের নির্মম অত্যাচারের কোনো প্রমাণ্য ভিডিও বা খবর কখনই নজরে পড়বে না। কর্নেল ভাটনগর বলেছেন, কাশ্মীরি মেয়েরা সন্ত্রাসবাদীদের লাম্পট্য, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, জবরদস্তি শাদি করা আর যখন খুশি তালাক দেওয়ার মতো বিকৃত কাজকর্মের সহজলভ্য শিকার। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত বহু তরুণীকে তারা নিজেদের লালসার বলি করে। এদের স্বামীরা, অভিভাবকরা নীরব থাকে হয় ভয়ে, নয়তো টাকার লোভে। মোদ্দাকথা কাশ্মীরি পুরুষরা আজ জেহাদিদের কাছে নপুংসকে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতি যারা মেনে নিতে পারেনি এমন বহু পরিবার (যাদের মধ্যে আতঙ্কবাদী দ্বারা গর্ভবতীও আছে) যাদের সরকারি সংখ্যা ৮০ হাজারের বেশি। ইসলামের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে (আজাদি বারাহি ইসলাম) এই ব্যাভিচার কতদিন চলবে?

ভারতের অবশিষ্টাংশ কি এ থেকে চোখ ফিরিয়ে কাটিয়ে দেবে? দেশের নারীদের রক্ষা করা দেশের যৌথ দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে জিহাদিদের কাছে কাশ্মীর একটা 'launching pad' মাত্র, যেখান থেকে তারা নবি কথিত চরম 'ঘজওয়া এ হিন্দ' প্রকল্পকে সফল করতে বদ্ধপরিকর। ভারতের হাতে সময় কম।

(জম্মুস্থিত নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিশ্লেষক)

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

রম্যরচনা

দুপুরে বাড়ির উঠোনে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খুব হইহট্টগোল করছিল। হট্টগোলে পল্টুর দাদুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দাদু বিরক্ত হয়ে পল্টুকে বলল— অ্যাই, পল্টু, এতো চেঁচামেচি করছিস কেন তোরা?

পল্টু—দাদু, আমরা তো খেলছি।

দাদু—এরকম চেঁচামেচি করে খেলা?

পল্টু—হ্যাঁ দাদু। আসলে তো আমরা এক ঘণ্টা সঙ্গে সুমন খেলছি।

* * *

বল্টু—ভাই, একটা ডিম গোটানো দেবে?

দোকানদার—সেটা আবার কী জিনিস।

বল্টু—ওই এগ রোল।

দোকানদার—সেটা বললেই হয়। ডিম গোটানো বলছেন কেন?

বল্টু—আজ তো ভাষা দিবস, তাই। কাল থেকে এগ রোলই বলব।



উবাচ

"আমরা দেশের স্বার্থ দেখি। আর কেউ কেউ দেখে পরিবারের স্বার্থ।"

দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সমর স্মারক উন্মোচন প্রসঙ্গে



নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"একতা এক জিনিস। আর প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা এক জিনিস। ছাত্রদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে।"

বারাসতে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণে



কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল

"ভারত কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে



ডোনাল ট্রাম্প
মার্কিন রাষ্ট্রপতি

"খুব শীঘ্রই আপনারা পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। সেজন্যই এখানে রাজ্য সরকার আমাদের হেলিকপ্টার নামতে দিচ্ছে না। আমাদের সভা করতেও দিচ্ছে না।"

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে



অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

"কিছু ব্যর্থ বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে অবসর সময়ে ভারত-বিরোধিতা করা।"

পুলওয়ামায় জঙ্গি হানা প্রসঙ্গে



জিতেন্দ্র সিংহ
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

পাকিস্তানের দ্রুত বিলয় ঘটুক

প্রবাল চক্রবর্তী

আজাদি কা মতলব ক্যা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

ভারতের চল্লিশজন বীর সৈনিকের নৃশংস হত্যার সঙ্গেই উপরিউক্ত স্লোগান শোনা গেছে বারামুলার ঘিঞ্জি গলিগুলোতে। যারা সেই স্লোগান দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে দশ বছরের বাচ্চাও আছে, ত্রিশ বছরের যুবকও আছে। কিন্তু এরা কেউই অশিক্ষিত বা গরিব নয়।

কাশ্মীরের সমস্যাকে বামপন্থীরা চিরকালই 'আজাদি'র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশন করে এসেছে। এদের কাছে তিব্বতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি অযৌক্তিক, যদিও তিব্বত কখনো স্বেচ্ছায় চীনের মধ্যে বিলয়ে স্বাক্ষর করেনি। উল্টোদিকে কাশ্মীরের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া দরকার, যদিও কাশ্মীর নিঃশর্তে ভারতে বিলয়ে স্বাক্ষর করেছিল। বামপন্থীদের সেই পুরোনো ঢোলটা এবার ফাঁসিয়ে দিয়েছে কাশ্মীরি সন্ত্রাসীরাই। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি? মিথ্যে কথা। আজাদি কা মতলব ক্যা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ— এই স্লোগানেই অর্থ একটাই। স্বাধীনতা নয়, ওদের লক্ষ্য ইসলামিক রাষ্ট্র। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নয়, এটা ধর্মীয় আগ্রাসন। যারা এই আগ্রাসনের হোতা, তাদের লক্ষ্য কিন্তু শুধুমাত্র কাশ্মীর নয়, তাদের লক্ষ্য গোটা ভারতবর্ষ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো 'জিহাদ-ফি- সবিলিল্লাহ', যার মানে, আল্লার জন্য নিরন্তর জিহাদ। এটা হলো ঘোষিত উদ্দেশ্য। অঘোষিত উদ্দেশ্য হলো, 'ঘজওয়া-এ-হিন্দ', যে কথাটা প্রায়দিন পাকিস্তানিদের মুখে শোনা যায়। ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের পয়গম্বর যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাকেই 'ঘজওয়া' বলে। তাহলেই বলুন, জিহাদ-ফি-সবিলিল্লাহ ও ঘজওয়া-এ-হিন্দ, এই যাদের লক্ষ্য, সম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রেখে তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের কোনো উপায় আছে কি? নেই। হাজার বছরেও শান্তি হবে না। ইসলামিক স্টেট তাদের মানচিত্রে ভারতকে তাদের সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছে, ভারতের নতুন নাম দিয়েছে 'খোরাসান'। সেখানে কাশ্মীরের কোনো আলাদা গুরুত্ব নেই। মিলিটারির ভাষায় 'বিচহেড' বলে একটা কথা আছে, যার মানে হলো, শত্রুর এলাকায় পা রাখার জায়গা, যেখান থেকে পরবর্তী আক্রমণ চালানো যায় শত্রুর এলাকার গভীরে। পাকিস্তান এদের কাছে ছিল প্রথম বিচহেড, কাশ্মীর হলো এদের কাছে পরবর্তী বিচহেড। একটা ভুল ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার দরকার আছে আমাদের। পুলওয়ামায় যেটা হলো, সেটা সন্ত্রাসী আক্রমণ নয়, সেটা যুদ্ধ। সেটা জেহাদ, ধর্মীয় আগ্রাসন। পৃথিবী থেকে প্রতিটি অমুসলমানকে মুছে ফেলবার অভিযান। ভারতের এখন কী করা দরকার? এই ধর্মীয় আগ্রাসনকে মেনে নেওয়া? আজ এই আগ্রাসন মেনে নিলে আগামীকাল গোটা দেশটাই এদের হাতে তুলে দিতে হবে। মধ্যযুগে ফিরে যাবে ভারতবর্ষ, যখন নিরীহ হিন্দু প্রজাদের মুণ্ডু দিয়ে বিজয়স্তম্ভ বানাতো মুসলমান শাসকরা, আপন খেয়ালখুশিতে। সেই পরিস্থিতির থেকে মৃত্যুও শ্রেয়।

ভয়ে কাঁপছে পাকিস্তান। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, পাকিস্তানের যেন দ্রুত বিলয় ঘটে। এটা কোনো ঘৃণা বা প্রতিশোধের কথা নয়। পাকিস্তানের বিলয় প্রয়োজন, কারণ যতদিন বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তানের অস্তিত্ব আছে, ভারতের স্বাধীনতা ততদিন নিষ্কণ্টক নয়।

এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে গেলে আজই কিছু করে দেখতে হবে। কিন্তু কী কী বিকল্প আছে ভারত সরকারের হাতে? প্রথম বিকল্প হলো, সরাসরি যুদ্ধ।

সরাসরি যুদ্ধে মাত্র সাতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাকিস্তান ভারতের দখলে আসতে পারে। যদি ভারত সরকার সেই বিকল্প বেছে নেয়, তবে কয়েকটা ব্যাপার সামলাতে হবে তাকে। চীন তার সেনাবাহিনী পাঠাতে পারে পাকিস্তানকে বাঁচাতে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধ মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবে। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে সেক্ষেত্রে। একই কথা ভারতীয় বায়ুসেনার বিষয়ে বলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু রাফাল বিতর্ককে কেন্দ্র করে আমরা জানতে পেরেছি, ভারতীয় বায়ুসেনার পরিস্থিতি সুবিধের নয়। কংগ্রেসের আমলে কোনো নতুন যুদ্ধবিমান কেনা হয়নি। নিয়মিত রাফাল নিয়ে অভিযোগ করে মোদীকেও নতুন বিমান কিনতে দেয়নি। পুরোনোগুলোর অবস্থা লড়ঝড়ে। তাই মূলত ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর ভরসা করেই ভারতকে আকাশে লড়তে হবে।

চীন কি সত্যিই পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের তিনটি স্বার্থ জড়িয়ে আছে। এক, চীন মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসার জন্য পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর ব্যবহার করে। দুই, পাকিস্তানের মাধ্যমে ভারতকে দুর্বল করে রাখে। তিন, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি সন্ত্রাসীদের মদত জোগালেও চীনের উইঘুর সন্ত্রাসীদের মদত জোগায় না পাকিস্তান। এর কোনোটিই অপরিহার্য স্বার্থ নয়। পাকিস্তানের গোয়াদরের পরিবর্তে ইরানের চাবাহার ব্যবহার করতে পারে চীন। ভারতকে দুর্বল রাখা আর সম্ভব নয়, এই বাস্তব পরিস্থিতিটা চীনের নেতৃত্বকে বুঝতে হবে। পাকিস্তানের বিলয় হলে তৃতীয় সমস্যাটাও থাকবে না। উল্টোদিকে, চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বাঁধলে আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনাম ভারতকে সাহায্য করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। মোদী এই সবকটি দেশের সঙ্গেই গভীর

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছেন আগে থেকে, হয়তো এমন একটি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই। চীনের দিক থেকে দেখলে এই যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোনো লাভ নেই, তাদের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সরাসরি যুদ্ধে ভারতের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে সেটা হলো, পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি। একাত্তরে ইন্দিরা গান্ধীকে এই সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি, কিন্তু আজ মোদীকে ঘামাতে হচ্ছে। ভারতের পক্ষে আছে রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী তন্ত্র, যা একইসঙ্গে ত্রিশটির বেশি ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশেই ধ্বংস করতে পারে। আরেকটা ব্যাপার। পরমাণু বোমা কোনো দিশি পেটো নয় যে ছুঁড়লেই ফাটবে। পরমাণু বোমার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে উচ্চ প্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক ডিটোনেটর ব্যবহার হয়। পাকিস্তান প্রযুক্তিতে উন্নত, এমনটা তাদের পরম মিত্ররাও দাবি করবে না। পাকিস্তান যে বোমাগুলোকে তুরুপের তাস মনে করে, সেই বোমাগুলো আদৌ ফাটবার যোগ্য তো? তার ওপর ইলেকট্রনিক সার্কিটকে দূর থেকে ধ্বংস করবার প্রযুক্তি রয়েছে ভারতের কাছে, তড়িৎচুম্বকীয় শস্ত্র কালী-১০,০০০। পরমাণু যুদ্ধে বিশেষ সহায়ক হবে এস-৪০০ ও কালী-১০,০০০। কিন্তু এতসবের পরেও সন্দেহ থেকেই যায়। যদি সব প্রতিরক্ষার ফাঁক গলে একটা পরমাণু বোমা ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছয়? এমন পরিস্থিতিতে ভারত প্রত্যাঘাত করবে, সেই প্রতিঘাতে পাকিস্তান দেশটারই আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু ভারতের প্রধান কয়েকটি শহর ধ্বংস হতে পারে। একশ' ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে দশ কোটি নাগরিক প্রাণ হারাতে পারে। বহু নাগরিক বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে। ভারতের অর্থনীতি পিছিয়ে যাবে কমপক্ষে দশ বছর। দাসত্বের থেকে মৃত্যু শ্রেয়, সেটা ঠিক। কিন্তু তবুও এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া সহজ নয় কোনো সরকারের পক্ষেই।

দ্বিতীয় বিকল্প হলো, অঘোষিত যুদ্ধ। এই পদ্ধতির সুবিধে হলো, পাকিস্তান চীনের সহায়তা চাইতে পারবে না, পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী, অত্যন্ত জটিল। মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। এক, পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন। দুই, দেশের মধ্যেকার সন্দেহজনক এনজিওগুলোর বিদেশি সাহায্য বন্ধ করা। এই দুটো কাজের সুফল মিলবে এখন। যদি ভারত সরকার অঘোষিত যুদ্ধের বিকল্পটাকে বেছে নেয়, তবে সেই আক্রমণের দুটো অভিমুখ থাকতে হবে। একটি অন্তর্মুখী, অন্যটি বহির্মুখী।

অন্তর্মুখী আক্রমণের অঙ্গ হিসেবে প্রথমেই শায়েস্তা করতে হবে 'অমন কি আশা' ও 'আজাদি' গ্যাংগুলোকে, যারা ভারতের মধ্যে বসে মদত জোগাচ্ছে পাকিস্তানকে। একই ব্যবস্থা নিতে হবে কাশ্মীরের 'হুরিয়ত কনফারেন্স' মার্কা নেতাদের জন্য। গ্রেপ্তার ও বিচারের লম্বা পদ্ধতি এড়িয়ে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে এদের। যারা অন্যদের পরকালে হুরির লোভ দেখায়, সেই হুরিয়ত নেতাদের স্বর্গে হুরিদের কাছে পাঠানো হোক। স্বভাবে এরা ভিতু, একজন দৃষ্টান্তমূলক ঠ্যাঙানি খেলে বাকিরা ভয় পাবে। গড়পড়তা দেখা গেছে, কাশ্মীরের সেনা স্কুলগুলোতে যেসব ছাত্ররা লেখাপড়া করে, তারা দেশভক্ত হয়। উল্টোদিকে মাদ্রাসাগুলো হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসীদের আঁতুড়ঘর। এর নিদান হিসাবে মাদ্রাসাগুলোকে বলপূর্বক বন্ধ করে দিতে হবে, স্থানীয় স্কুলগুলোকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। বারামুলার মতো সন্ত্রাসী-অধ্যুষিত জায়গাগুলোর মূল সমস্যা হলো গা-ঘেঁষা বাড়ি, সে বাড়িগুলোর প্রতিটিতেই জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকেদের বাস। এইসব জায়গায় মহল্লা ধরে ধরে চিরুনি তল্লাসি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে নকশাল দমনের ও পঞ্জাবে উগ্রপন্থী দমনের অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। পাথর ছুঁড়তে আসা তৌহিদি জেহাদিদের বিরুদ্ধে টিয়ারগ্যাস, রায়ট শিল্ড ব্যবহার করতে হবে নির্বিচারে। এদের মধ্যে যারা নেতাগোছের, তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে চুপিচুপি। আমরা এতদিন কাশ্মীরে শুধুমাত্র পদাতিক সৈন্যদেরই ব্যবহার করে এসেছি। এখন প্রয়োজনে সাঁজোয়া গাড়ি, ড্রোন ও মিসাইল ব্যবহার করতে হবে। উদ্দেশ্য, আমাদের সেনাদের ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি করে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা। ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারাদুটিকে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত করতে পারেন। সে অধ্যাদেশ এমনভাবে আনতে হবে, যাতে সেটা আদালতে হেরে না যায়। তিনমাস হবে সেই অধ্যাদেশের মেয়াদ, তারমধ্যেই কেল্লাফতে করতে হবে। বারামুলার মতো জায়গায় সন্ত্রাসের প্রতি সহানুভূতিশীল বাসিন্দাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। মূল ভূখণ্ড থেকে সশস্ত্র রাষ্ট্রভক্তদের এনে সেখানে বসতি গড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিন মাসেই কাশ্মীরের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলে দিতে হবে। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। ওরা একরাতে কাশ্মীর হিন্দুশূন্য করেছিল, মনে আছে তো?

অঘোষিত যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর বহির্মুখী অভিমুখটা। তার অঙ্গ হিসেবে প্রথমেই সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ শুরু করতে হবে। শুধু ভারতের সীমান্তেই নয়, পাকিস্তানের চারটে সীমান্তেই। ভারত, ইরান ও আফগানিস্তান, তিনটি দেশ মিলে সীমান্ত জুড়ে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। পাকিস্তানের বন্দরে যেসব জাহাজ আসবে, ডুবোজাহাজ ব্যবহার করে তাদেরকে ক্রমাগত ডুবিয়ে দিতে হবে। সবদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে পাকিস্তানকে। যে কোনো দেশের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে তার আর্থিক সম্পন্নতার ওপর। সেই আর্থিক সম্পন্নতা অনেকটাই নির্ভরশীল দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ওপর। সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে পাকিস্তানের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিতে হবে। ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি হ্যাক করে ব্যাঙ্কগুলোকে দেউলিয়া করে দিতে হবে। ভারতের সুপারকম্পিউটার ও আমাদের তুখোড় প্রযুক্তিবিদরা সহায় হবে এই কাজে।

বিশ্বাস আছে, ভারত ঠিকই প্রতিশোধ নেবে। মোদী যেমন তেমন নেতা নন, তাঁকে ভয় পায় পাকিস্তানের লোকেরাও। তার পরিচয় ইমরান খানের সাম্প্রতিক ভাষণে, পরিচয় পাকিস্তানি টিভির সাম্প্রতিক প্রসারণগুলোতে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ভয়ে কাঁপছে ওরা প্রত্যেকে। দেখা যাক, কী হয়। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, পাকিস্তানের যেন দ্রুত বিলয় ঘটে। এটা কোনো ঘৃণা বা প্রতিশোধের কথা নয়। পাকিস্তানের বিলয় প্রয়োজন, কারণ যতদিন বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তানের অস্তিত্ব আছে, ভারতের স্বাধীনতা ততদিন নিষ্কণ্টক নয়। ■

পাগলও নিজের ভালো বোঝে বাঙ্গালি বোঝে না

প্রণব দত্ত মজুমদার

সম্প্রতি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ৮ জানুয়ারি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ যখন দেশের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ আবার সংসদে পেশ করেন তখন দেখা গেল সরকার- বিরোধী দলগুলি বিশেষ করে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূল দলের সাংসদরা যথারীতি সেকুলারিজমের দোহাই দিয়ে মানবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সংসদ কক্ষ থেকে 'ওয়াক আউট' করলেন। কিন্তু 'ওয়াক আউট' করার আগে এঁরা 'সেকুলারিজম' 'মানবতা' ইদ্যাদি নিয়ে এমনসব ভাষণ দিলেন, মনে হলো এঁরা যেন সবাই এক একজন মহামতি বুদ্ধ। কিন্তু ভোটের কারণে মুসলমানদের তোষণ করা বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ-কারীদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই যে তাঁদের এত উদ্বেগ ও আকুলতা এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ এই দলগুলির সবাই 'মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক'-এর দৌলতে ভোট বৈতরণী পার হতে চায়। কথা হলো এদের ভণ্ডামি আর কতদিন মেনে নেবে দেশবাসী?

'দি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫' অনুযায়ী, বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া কোনো বিদেশি নাগরিক যদি ভারতে আসেন বা অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ধরে যদি ভারতে বসবাস করেন তবে তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের প্রতিশ্রুতিমতো ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই নাগরিকত্বের সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যাতে প্রস্তাব করা হয়—

কথায় আছে 'পাগলও তার ভালোটা বোঝে'। কিন্তু আমরা কেন এখনো আমাদের ভালোটা বুঝে উঠতে পারছি না? আমরা কি পাগলেরও অধম?

পাকিস্তান, বাংলাদেশে, আফগানিস্তান থেকে ৩১.১২.২০১৪ সালের আগে যেসব হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি এবং খ্রিস্টান লোকেরা ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং ভারতে বসবাস করছেন তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা হবে না, তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে যদি তাঁরা ভারতে ৬ বছর ধরে বসবাস করে থাকেন। কারণ নিকট অতীতে উক্ত দেশগুলি ভারতেরই অংশ ছিল এবং ধর্মীয় কারণে উক্ত দেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েছে। ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উক্ত দেশগুলিতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোনো জায়গা নেই এবং তাঁরা অমানুষের মতো অত্যাচারিত হয়। কট্টর ইসলামপন্থীদের আর একটা উদ্দেশ্য হলো অমুসলমানদের অত্যাচার করে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এ ব্যাপারে মেয়েদের সফট টার্গেট করে। এই সমস্ত কারণে উক্ত ইসলামিক দেশগুলি গঠন হওয়ার পর থেকে বছরের পর বছর ধরে ওই সমস্ত দেশের সংখ্যালঘুরা অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি, খ্রিস্টানরা ভারতে চলে এসে বসবাস করছেন। কিন্তু তাঁদের নাগরিকত্ব দানের ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে।



কারণ সেকুলারবাদীদের বক্তব্য হলো এভাবে সেকুলার ভারতে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না, তাহলে ওইসব দেশ থেকে আসা মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব দিতে হবে। কথা হলো, ইসলামের কানুন পুরোপুরি মেনে চলার তাগিদে হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না বলে ৯৫ শতাংশ মুসলমানই আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছিল বলেই ভারত ভাগ হয়েছে। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শিরা ভারত ভাগ চায়নি। তাঁরা ভারতের নাগরিক হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন। পূর্ববর্তী কংগ্রেস কমিউনিস্ট নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে দেশভাগের ফলে তাঁদের আদি বাসস্থান ভাগ্যের ফেরে উক্ত ইসলামিক দেশগুলির অংশীভূত হয়ে যায়, যার উপর এইসব মানুষগুলির কোনো হাত ছিল না। তাঁরা এখন ধর্মীয় বিদ্বেষের বলি হচ্ছেন। উক্ত দেশ থেকে আসা মুসলমানরা কিন্তু ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে পালিয়ে আসা লোক নয়। তাঁরা ভারতে এসেছে বা আসছে এদেশের নানারকম সুযোগসুবিধা ভোগ করার আশায় ভারতের মানুষের সম্পদের উপর ভাগ বসাবার জন্য— তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু ভণ্ড সেকুলারবাদীরা ঐতিহাসিক সত্যকে মান্যতা না দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক ব্যাবহার করার লালসায় সেকুলারবাদের মোড়কে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না বলে সংসদে হৈচৈ করে বিলটিকে পাশ করতে চায়নি। লোকসভায় এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় বিলটি পাশ করে দেয়; কিন্তু রাজ্যসভায় উপযুক্ত গরিষ্ঠতা না থাকায় বিলটি পাশ হয়নি। বিলটিকে জে পি সি তে পাঠানো হয়।

জে পি সি থেকে রিপোর্ট আসার পরে এই শীতকালীন অধিবেশনে ৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে পেশ করেন। যথারীতি ভণ্ড সেকুলারবাদী নেতারা জ্ঞানগম্ভীর বক্তৃতা দিয়ে বিলের বিরোধিতা করে সংসদ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, যা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবারেও এনডিএ-র সংখ্যাধিক্যের কারণে লোকসভায় তা পাশ হয়ে যায়। কিন্তু রাজ্য সভায় উপযুক্ত সংখ্যা না থাকায় এবং বিরোধীদের চক্রান্তের কারণে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় জুড়ে ব্যাপক গোলমালের জেরে বিলটি রাজ্য সভায় পেশ করা যায়নি। অর্থাৎ এবারেও ঝুলে রইল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র নাগরিকত্বের ব্যাপারে বিলের সংশোধন করলেই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে এন আর সি অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনের কাজ বা সঠিক নাগরিকদের চিহ্নিত করে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজটিও সারা দেশ জুড়ে অনতিবিলম্বে করতে হবে। এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে যে সব মুসলমান আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে এদেশের জনগণের সম্পদের উপর ভাগ বসাচ্ছে এবং এদেশের নিরাপত্তার ব্যাপারটিকেও যথেষ্ট উদ্বেগের মুখে ঠেলে দিছে দেশের জনবিন্যাসের (ডেমোগ্রাফির) ভারসাম্যকে বিপজ্জনকভাবে নষ্ট করছে তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে।

সরকারকে এই সমস্ত ব্যাপারে যথাযথ ভাবে আইন প্রণয়ন করে এবং তার সঠিক প্রয়োগ করে দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে হবে। নেতাদের এই নিয়ে ভোটের জন্য নোংরা রাজনীতি করলে হবে না। জনসাধারণকেও এ ব্যাপারে সতর্ক এবং সচেতন হতে হবে। তাঁরা যেন এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের ফাঁদে পা না দেন। এঁদের ভণ্ডামির জন্য যে দেশের 'ডেমোগ্রাফি'র ভারসাম্য ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছে এবং যে কারণে ভারত বিভক্ত হয়েছিল সেই কারণ যে আবার ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে তা যদি দেশবাসী দ্রুত উপলব্ধি করতে না পারেন তবে ভারত আবার বিভাজনের দিকে যাবে।

সূক্ষ্মভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এইসব অনুপ্রবেশকারীরা একটি দীর্ঘকালীন ইসলামিকরণের পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। এরা ভারতের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের জোরে এ দেশে আবার ইসলামের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে। ইসলামের ইতিহাস ভালোভাবে অনুধাবন করলে এ সত্যটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ৪টি মহাদেশ জুড়ে, ১৪০০ বছরে ৫৭টি ইসলামিক দেশ এ ভাবেই গঠিত হয়েছে। তারা জোটবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছে ও আই সি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন)। এনডিএ-র শরিক রাজনৈতিক দলগুলি, যারা নাগরিক সংশোধনী বিল, এন আর সি এইসব চালু করার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন, তাদের উচিত জনসাধারণকে এ ব্যাপারে ভালোভাবে সচেতন করা। এ ব্যাপারে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ দেখা যাচ্ছে বিরোধীরা ভোটের ফয়দা তোলার জন্য এ ব্যাপারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। এ ব্যাপারে গত ডিসেম্বরে মেঘালয় হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস সুদীপরঞ্জন সেন নাগরিক পঞ্জিকরণ সংক্রান্ত একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে নির্ভীক ভাবে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— এটা ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে। মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না এই যুক্তিতেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য দেশ ভাগ করে আলাদা দেশ পাকিস্তান গঠন করেছে। স্বাভাবিক যুক্তিতেই ভারতবর্ষের হিন্দুরাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল।

যাইহোক ভারতবর্ষের সেকুলারিজমের মর্যাদা দিয়ে তিনি বলেছেন যে— নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত ঐতিহাসিক সত্যটিকে আমাদের মাথায় রাখা উচিত এবং ভারত ভাগের ফলে যে সমস্ত হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্শি, খাসিয়া, জন্তিয়া, গারো ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অমুসলিম মানুষেরা ধর্মীয় নিপীড়নের স্বীকার হয়ে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছে তাঁদের এদেশে কোনো ভিত্তিবর্ষ বিচার না করেই নাগরিকত্ব দিতে হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন— দেখা যাচ্ছে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা নানারকম ডকুমেন্ট জোগাড় করে এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু যথার্থ কারণে যেসব অমুসলমানদের এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা তাঁরা নানা আইনি জটিলতার কারণে নাগরিকত্বের ব্যাপারে আটকে যাচ্ছেন। এটা খুব বিপজ্জনক। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন— ''Nobody should try to make India another Islamic Country, otherwise it will be a doomsday for India and the world.''

কথায় আছে 'পাগলও তার ভালোটা বোঝে'। কিন্তু আমরা কেন এখনো আমাদের ভালোটা বুঝে উঠতে পারছি না? আমরা কি পাগলেরও অধম? ■

নাগরিকত্ব বিলের ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা

জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি

লোকসভায় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬ টিভির পর্দায় দেখতে দেখতে যখন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের বক্তব্য শুনলাম তখন ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ছিল, কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাক কাকের মাংস না খেলেও বাঙ্গালি বাঙ্গালির মাংস খায়।

যাই হোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে বিলটি নিয়ে এখন সমগ্র ভারতীয় রাজনীতি উত্তাল সেই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬- এর প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তার বিশ্লেষণ করা যাক।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে জাতির রক্ত সবচেয়ে বেশি ঝরেছিল সেই জাতি অর্থাৎ বাঙ্গালি হিন্দু জাতি, সেই জাতিকে নিয়ে মূলত এই বিলটি।

ভারতবর্ষকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ করার ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল শুধুমাত্র মুসলমানদের বসবাসের জায়গা হিসাবে। সেখানে অমুসলমানদের জায়গা কতটুকু সুরক্ষিত সেটা বোঝা যায় দেশভাগের পর সেখানকার হিন্দুদের করুণ পরিণতি এবং ধর্মীয় কারণে উৎখাত হওয়ার ঘটনার রক্তাক্ত পুনরাবৃত্তি দেখে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া ভারতে যখনই কোনও ঘটনা ঘটে তখন তার প্রকোপ গিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে বসবাসরত হিন্দুদের উপর। সে ১৯৬৪ সালে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাই হোক বা ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পরই হোক বা ২০০১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরই হোক বা ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে সংঘটিত হওয়া হিন্দু নিধন যজ্ঞই হোক।

১৯৬৪ সালে জেহাদিরা যখন জম্মু কাশ্মীরের হজরত বাল মসজিদে রাখা হজরত মহম্মদের চুল চুরি হয়ে গিয়েছে বলে গুজব রটিয়ে দেয় তখন ইসলামি ধর্মান্ধদের প্রকোপ গিয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দোকান, ঘরবাড়ি এবং হিন্দু মা বোনেদের উপর। জম্মু কাশ্মীর যেহেতু ভারতের অংশ এবং ভারত মানেই হিন্দুদের দেশ, তাই ধর্মান্ধদের কোপ গিয়ে পড়ে হিন্দুদের উপর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বেছে নেয় নিরীহ হিন্দুদের। অসংখ্য হিন্দু মা বোনদের ধর্ষণ করা হয় এবং মুসলমান না হওয়া হিন্দু পুরুষদের প্রকাশ্যে হত্যা করে জাতিগত নির্মূলীকরণের খেলায় মেতেছিল পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের পোষ্য বাংলাদেশী দোসর আলবদর রাজাকার ও আল শামস নামক বাহিনী।

পাক ভারত যুদ্ধে পরাজয়ের শোধ তুলতে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে হিন্দুদের সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। এইভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ হিন্দুদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নামে প্রভাবশালী মুসলমান এবং মুসলমান রাজনীতিবিদেরা সেগুলো দখল করে।

শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের সাহায্য নিয়ে পাক কারাগার থেকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে আসা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশের শত্রু সম্পত্তি নামক আইনটি



রোহিঙ্গাদের হয়ে পুরো বিশ্ব কথা বললেও এই নিরীহ বাঙ্গালি হিন্দু জাতির হয়ে একটি টুঁ শব্দ করার লোকও নেই। অথচ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতমাতার জন্য নিজের প্রাণ বলিদান দিতেও যারা দ্বিধাবোধ করেনি সেই মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-সহ বাঘাযতীন, উল্লাসকর দত্ত, নীহার মুখার্জি, শিবদাস ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীভাভূষণ মিত্র, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলি, প্রফুল্ল চাকি, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, কল্পনা দত্ত, বিনোদবিহারী চৌধূরী, সুবোধ রায়, অনন্ত সিংহের উত্তরসূরিদের আজ স্বাধীন ভারতে নাগরিকত্বের জন্য ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে।

নিষিদ্ধ করেননি। হিন্দুদের সম্পদ বঞ্চিত করার রাস্তা খুলে রেখেছিলেন। প্রতিবছর বাঙ্গালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার সময় জেহাদি গোষ্ঠী মুখিয়ে থাকে মন্দির ভাঙার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য কোনও সময় নেই। যাঁরা এখানে ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলন করেন। কোথায় ছিল তাদের কলম যখন ১৯৯২ সালের ৭ই ডিসেম্বর হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় মন্দির ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আক্রমণ করা হয়। ঢাকায় ভোলানাথ গিরি আশ্রম ধ্বংস ও লুঠ করা হয়। এখানকার ভণ্ড নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ওই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না।

আরেকটি বড় ধরনের হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু হয় ২০১৩ সালে। মুক্তিযুদ্ধের মানবতাবিরোধী অপরাধে মিরপুরের কসাই নামে পরিচিত কাদের মোল্লার প্রত্যাশিত ফাঁসির রায় না পেয়ে বাংলাদেশের লক্ষ তরুণ জমায়েত হয় রাজধানী ঢাকার শাহবাগে। ফলে প্রচণ্ড চাপে থাকা ইসলামি দল জামাত এবং প্রধান বিরোধী দল বি.এন.পি মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে ক্ষমতার চাবিকাঠি হিসাবে আবারও বেছে নেয় সংখ্যালঘুদের। দেশব্যাপী একের পর এক মন্দির হিন্দু ঘরবাড়ি এবং বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। ২০১৪ সালে নির্বাচনের পর আবার শুরু হয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন, যেখানে অনেক জায়গায় শাসকগোষ্ঠী আওয়ামি লিগের লোকজনও যে জড়িত ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গবেষণা গ্রন্থ অ্যান ইনকোয়ারি ইনটু কজেস অ্যান্ড সিকোয়েন্সেস অব ডিপ্রাইভেশন অব হিন্দু মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ থ্রু দ্য ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট বইয়ে লিখেছেন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের আওতায় হিন্দু পরিবারগুলো যত জমি হারিয়েছে তার মোট আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় ৯৪৪৬৪০ মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা যা বাংলাদেশের জিডিপির শতকরা ৫৫ ভাগ এবং ২০০০—২০০১ এ বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেটের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।

আবুল বারকাত একটি বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ১১.৩ মিলিয়ন হিন্দু ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। তার অর্থ এই যে গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু প্রতিদিন দেশত্যাগ করছে। বছরের হিসাবে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ২৩০৬১২ জন। তাঁর ৩০ বছরের গবেষণা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন আগামী ত্রিশ বছরের পর বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবে।

রোহিঙ্গাদের হয়ে পুরো বিশ্ব কথা বললেও এই নিরীহ বাঙ্গালি হিন্দু জাতির হয়ে একটি টুঁ শব্দ করার লোকও নেই। অথচ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতমাতার জন্য নিজের প্রাণ বলিদান দিতেও যারা দ্বিধাবোধ করেনি সেই মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-সহ বাঘাযতীন, উল্লাসকার দত্ত, নীহার মুখার্জি, শিবদাস ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীভাভূষণ মিত্র, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলি, প্রফুল্ল চাকি, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, কল্পনা দত্ত, বিনোদবিহারী চৌধুরী, সুবোধ রায়, অনন্ত সিংহের উত্তরসূরিদের আজ স্বাধীন ভারতে নাগরিকত্বের জন্য ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে এর থেকে লজ্জার আর কী বা হতে পারে। তাঁরা তো তাঁদের উত্তরসূরিরা নিজদেশে পরদেশি হবে এইভেবে রক্ত দেননি।

কিছু স্বার্থলোভী মানুষের অপকর্মের মাধ্যমে দেশকে দ্বিখন্ডিত করে দিয়ে তাদেরকে পরদেশি বানানোর দায় তো ওই নিরীহ হিন্দুদের নেই।

এই অভিশপ্ত জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে পূর্বতন আর এস এস প্রচারক নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই বিলটি নিয়ে আসেন ভারতের সংসদে। নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন ছিল অভিশপ্ত বাঙ্গালি হিন্দু জাতিকে রক্ষা করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পিছনে একটি ইতিহাস রয়েছে।

কী এই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস যা আমাদের যুব সমাজকে জানতে দেওয়া হয়নি।

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার পর জিন্নার মদতে সোহরাবর্দির নেতৃত্বে যখন Great Calcutta Killing এবং নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং ভারতবর্ষের বাঁটোয়ারা হবে নিশ্চিত হয়ে যায় তখন পুরো Bengal Province (East & West Bengal) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উপলব্ধি করেন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া পাকিস্তানে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তারই ভিত্তিতে তিনি ''বাঙালি হিন্দু Homeland movement' শুরু করেন। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে Bengal Provincial Hindu Mahasabha জোরদার প্রচার শুরু করে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। ওই বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনদিনের একটি সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয় যেটি তারকেশ্বর সম্মেলন নামে খ্যাত, যেখানে অবিভক্ত বাংলা থেকে আগত সমস্ত delegates মিলে একটি Resolution পাশ করে যার মূখ্য বিষয় ছিল শুধুমাত্র বাঙ্গালি হিন্দুদের সুরক্ষিত থাকার জায়গা নিশ্চিত করা। এর থেকে বোঝা যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন।

এরপরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ২০ জুন ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার সমস্ত বিধানমণ্ডলের হিন্দু সদস্য মিলে ভোট দিয়ে আমাদের এই পশ্চিমবাংলা নামক রাজ্য সৃষ্টি করেন শুধুমাত্র বাঙালী হিন্দুর বসবাসের জায়গা হিসাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই পূর্ববঙ্গের হিন্দু বিধায়কদের উত্তরসূরিদের বাঙালি হিন্দুর জন্য সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করছে মহম্মদ সেলিম-ডেরেক ও ব্রায়নরা। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত বাঙালি হিন্দুদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।■

অধ্যাদেশ জারি করে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হোক

ধর্মানন্দ দেব

নাগরিকত্বের নামে সাধারণ আমজনতা সমগ্র অসমে যেভাবে হয়রানি হচ্ছেন তা এককথায় সভ্যসমাজে অকল্পনীয়। কেননা অসমে এক'শটি ট্রাইবুন্যালে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু মানুষ নানাভাবে হেনস্থা হচ্ছেন। এই নাগরিকত্বের নামে দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু মানুষ ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি।

প্রথা অনুসারে আইন প্রণয়নই ভারতের সংসদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যারা এই কাজ অতিবাহিত করেন তারা হচ্ছেন দেশের আইন প্রণেতা অর্থাৎ সাংসদ। ভারতের সংবিধানের ২৪৫ ও ২৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মতে সংসদ সমগ্র ভারতে অথবা দেশের বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে তিনটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্র তালিকায় সংসদের ক্ষমতা পরিপূর্ণ। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে সংসদের আইনের সঙ্গে বিধানসভা প্রণীত আইনের বিরোধ দেখা দিলে পূর্বোক্ত আইন বলবৎ থাকে। অবশিষ্ট বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা সংসদের উপর অর্পিত হয়েছে।

সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে নাগরিকত্ব অর্জন, বাতিল বা এই সংক্রান্ত বিষয়ে আইন করার বল্গাহীন ক্ষমতা রয়েছে সংসদের। আর সংবিধান প্রদত্ত এই ক্ষমতা অনুসারেই ১৯৫৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংসদে পাশ হয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫। ইতিমধ্যে এই আইন সংসদে বেশ কয়েকবার সংশোধনও হয়েছে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে আবার সংশোধনের জন্য কেন্দ্রের বর্তমান ক্ষমতাসীন মোদি সরকার ২০১৬ সালের ১৯ জুলাইয়ের বাদল অধিবেশনে লোকসভায় এক সংশোধনী বিল পেশ করে। তখন বিল নম্বর ছিল ১৭২। কংগ্রেস দলসহ অন্যান্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রবল বিরোধিতায় বিগত ১১ আগস্ট, ২০১৬ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বাধ্য হয়ে বিলটি আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষণের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান। যৌথ সংসদীয় কমিটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার উপর ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে লোকসভায় পেশ করে ৪৩৮ পাতার এক



দীর্ঘ রিপোর্ট। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে নতুন সংযোজন ঘটে—

''any proceeding pending against any person belonging to minority communities, namely. Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan shall be abated and such person shall be eligible to apply for naturalisation under section 6 of the Citizenship Act. 1955''

২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে লোকসভায় নতুন সংযোজন নিয়ে পেশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯। বিল নম্বর '১৭২-সি'। ওইদিনই লোকসভায় বিলটি পাশ হয়। পরে রাজ্যসভায় বিলটি লোকসভা থেকে পাঠানো হয়। রাজ্যসভায় আলোচনার জন্য ১২ ও ১৩ জানুয়ারি তারিখে সংশোধিত তালিকায় আলোচনার জন্য রাখা হয়। কিন্তু সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি হট্টগোলের জন্য রাজ্যসভা ১৩ জানুয়ারি দুপুরবেলা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। আর এটাই ছিল বর্তমান কেন্দ্রে সরকারের শেষ অধিবেশন। তাই এই সংশোধনী বিলটি সংসদ কর্তৃক আইনে রূপান্তরিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেননা লোকসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন বন্ধ। নতুন লোকসভা গঠন করতে হবে ৩ জুনের মধ্যে। তাই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৯-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ৩ জুন। কিন্তু মেয়াদ থেকে কী হবে। যেহেতু ষোড়শ লোকসভা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং যেহেতু নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলটি উত্থাপন হয়েছিল লোকসভায় সেইহেতু

লোকসভা ভঙ্গের সাথে সাথে বিলটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। নতুন সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর পুনরায় বিলটি লোকসভায় উত্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে আবার আলোচনা হবে এবং সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হতেও পারে। লোকসভায় পাস করানোর পর রাজ্যসভায় পাস করাতে হবে। তাই এককথায় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই অবস্থায় অধ্যাদেশ হচ্ছে একমাত্র নিরাপদ সমাধানসূত্র। উল্লেখ্য রাম মন্দির ও তিন তালাকের বিষয় থেকে নাগরিকত্বের অধ্যাদেশের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা নাগরিকত্ব বিলের প্রস্তাবিত নাগরিকত্বের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে one time amnesty। আর এই কাজ বর্তমান মোদি সরকারের পক্ষেই সম্ভব। ৭০ বছরের পুরানো সমস্যা নিরসনে এগিয়ে এসেছে একমাত্র বিজেপি সরকার। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লোকসভায় এই বিল পাস করিয়েছিল। বিলের পক্ষে মতামত প্রদান করেছিল সিলেক্ট কমিটি। তাই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল নিয়ে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হবে।

অন্যদিকে আধুনিক জীবনে নাগরিকত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব হচ্ছে গণতন্ত্রের ব্যাপার। কিন্তু এই নাগরিকত্বের নামে সাধারণ আমজনতা সমগ্র অসমে যেভাবে হয়রানি হচ্ছেন তা এককথায় সভ্যসমাজে অকল্পনীয়। কেননা অসমে এক'শটি ট্রাইবুন্যালে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু মানুষ নানাভাবে হেনস্থা হচ্ছেন। এই নাগরিকত্বের নামে দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু মানুষ ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত এন.আর.সি-র খসড়ায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম আসেনি। পুনরায় দাবি ও আপত্তির সময় প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ তাদের নিজ নিজ দাবি দাখিল করতে পারেননি। দাবি দাখিল যারা করেছেন তাদের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের উপর আবার আপত্তি দাখিল হয়েছে। অসমের লক্ষ লক্ষ ভোটারের গায়ে ডি-ভোটার তকমা লাগানো। এদের বেশিরভাগ হিন্দু মানুষ বলে জানা যায়। অসমের এই নাগরিকত্ব সমস্যা লাঘবের জন্য ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করা এইমুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জরুরি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনবোধের সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র রাষ্ট্রপতির কাছে। কেননা সংবিধানের ১২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করে আইন লাগু করতে পারেন। সাধারণত যখন সংসদ অকার্যকর থাকে অথবা যখন সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির কাছে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট প্রস্তাব পাঠালে রাষ্ট্রপতি নিজের একক ক্ষমতার বলে যে আইন জারি করে থাকেন সেটাকে আমরা 'অধ্যাদেশ' হিসাবে জানি। এই সমস্ত অধ্যাদেশ আইনের মর্যাদা ও গুরুত্ব পায়। একমাত্র এই সমস্ত অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে সংসদ চালু হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে সংসদের অনুমোদন নিতে হয়। একথা বলা হয়, রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিচার বিভাগের এক্তিয়ারের বাইরে।

উল্লেখ্য, এই অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা নিয়েও দেশের সর্বচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্টে বেশ কয়েকবার মামলা হয়েছে। এইসব মামলা থেকে পরিষ্কার যে অধ্যাদেশের সাংবিধানিক বৈধতা স্বীকৃত। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা কিন্তু সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মতোই সীমাবদ্ধ। কোন বিচারাধীন বিষয়, মৌলিক অধিকার, সপ্তম তফশিলে বর্ণীত আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ জারি করা যায় না। সে যাইহোক বর্তমান আলোচিত নাগরিকত্ব নিয়ে আদালতে কোনও মামলা দাখিল হয়নি। প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পটভূমি কিন্তু সেই ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক বিভাজন। কারণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন সর্বজনবিদিত। শুধু তাই নয়, ওইসব সংখ্যালঘুদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণও করা হয়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রালয়ের বাজেট। সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ। কারণটি হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং', অর্থাৎ সংখ্যালঘু-শূন্য রাষ্ট্রে পরিণত করা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যাগুরুরা প্রকৃতপক্ষে চায় না বাংলাদেশে একটিও হিন্দু পরিবারের অস্তিত্ব থাকুক। তাইতো চলছে ধারাবাহিক আক্রমণ। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি জনগণনার রিপোর্ট। এই কারণেই ওদের ভারতে আশ্রয় নেওয়াটা অতি স্বাভাবিক। তাই কেন্দ্রের সরকার মানবিক কারণেই ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টম্বর তারিখে দু'টি রুলসের সংশোধনী করে তাদের ভারতে বসবাসের অধিকার দিয়েছে। এই দুটি রুলসের সাথে মিল রেখেই আনা হয়েছিল এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯। বিরোধীরা বলছেন, ওই বিলে নাকি 'নাগরিকত্বের' কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা ভারতবর্ষের সংবিধান বা ভারতের কোন আইনেও নেই। সংশোধনীতে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। তাই ঢালাও নাগরিকত্ব বা পাইকারিভাবে নাগরিকত্ব প্রদানের কথা না থাকা বাস্তবসম্মত।

আবার ফিরে আসি মূল বিষয়ে, বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী দেশে আনতে হলে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের কাছে একটিমাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে সরকারের মানসিকতা ও ইচ্ছাশক্তির উপর। কারণ সংবিধান মতে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির কাছে দেশে অধ্যাদেশ জারি করে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী লাগু করতে চায় বলে একটি প্রস্তাব পাঠাতে হবে। আর এই প্রস্তাব পেয়ে রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। আর এই কাজ করতে হলে শীঘ্রই করতে হবে। কেননা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট আর দূরে নেই। বড়জোর আর এক মাস। তারপরই এসে যাবে সেই বহুপ্রতীক্ষিত মহাসংগ্রামের দিন।

দেশের শাসন ক্ষমতার মসনদ দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে শাসক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই এক্ষুনি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট অধ্যাদেশ জারির প্রস্তাব পাঠাক রাষ্ট্রপতির কাছে। তখনই রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে সমগ্র দেশে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু করতে পারবেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করানোর জন্য সংসদদের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বিফল হয়েছে সেই আবেদন। তাই এখন চাই অধ্যাদেশের মাধ্যমে নাগরিকত্ব সংশাধনী। ■

পাশ্চাত্যে হিন্দু জাগরণ

খবরে প্রকাশ (পিটিআই), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে এই প্রথম কোনো হিন্দু মহিলা হতে পারেন নির্বাচিত। আর এমনটা ঘটলে তা হবে আমেরিকার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাছাড়া তামাম বিশ্বের হিন্দুদের কাছেও সেটা হবে এক অভাবনীয় খুশির খবর। কারণ পাশ্চাত্যের একটি দেশে বিশেষত বিশ্বের সর্বশক্তিমান আমেরিকার সিংহাসনে প্রেসিডেন্ট রূপে এক হিন্দু মহিলার আরোহণ হিন্দু জাতিকেই শুধু গৌরবান্বিত করবে না, গৌরবান্বিত করবে প্রাচ্যের এবং বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্মকেও। প্রমাণ হবে, স্বামীজীর কথায়, 'সর্বধর্মের জননী স্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম'-এর সাম্যতা, বহুত্ববাদিতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শান্তি, সৌহার্দ্য ও বিশ্বজনীনতা। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই বিধৃত হয়েছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' ইত্যাদি বাণী বা মন্ত্র, যা মানবজাতির সবার জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে প্রাচ্যধর্ম বা হিন্দু ধর্ম যে অস্পৃশ্যতা, গোঁড়ামি, ভেদাভেদ, বর্ণবাদ, কুসংস্কার, বিদ্বেষ, অমানবিকতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত, তাও হবে প্রমাণিত। আর যাঁকে নিয়ে এতসব কথা, তিনি হচ্ছেন তুলসী গাবার্ড। আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চার বারের নির্বাচিত সিনেটর বা সাংসদ। তুলসী জন্মসূত্রে মার্কিনি। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি হন ধর্মান্তরিত। গ্রহণ করেন হিন্দু ধর্ম।

প্রথম সিনেটের নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন কংগ্রেসে গীতা হাতে শপথ গ্রহণ করতে গিয়ে ভীষণ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তুলসী যদি দলীয় মনোনয়ন পান এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ প্রথম মহিলা এবং প্রথম কোনো অ-খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দু মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এখানেই শেষ নয়। আছে আরও সুখবর। বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হতে পারেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইন্দ্রানুয়ি। তিনি 'পেপসিকো'র প্রাক্তন সিইও। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ)-এর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত গীতা গোপীনাথ। তিনিই প্রথম কোনো মহিলা যিনি ওই শীর্ষপদ পেলেন।

২০১৮ সালে তিনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আই এম এফ-এ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বয়স ৪৭ বছর। গীতার জন্ম কলকাতায় ১৯৭৯ সালে। পড়াশুনা এদেশেই। অর্থনীতির পিএইচডি গীতা হার্ভার্ডে যোগ দেন ২০১০ সালে।

সত্যি বলতে কী, ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা, বিশেষত হিন্দুরা আজ বিশ্ব জয়ের পথে। তবে তা যুদ্ধ বা বাহুবলে নয়, মেধাবলে। কবির কল্পনা (ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে) আজ বাস্তব রূপ লাভ করতে চলেছে। সত্যি হতে চলেছে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণীও— ''ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া... আমার বিশ্বাস— ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে... আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে'... যেদিন বিশ্বকে পথ দেখাবে, নেতৃত্ব দেবে হিন্দু ভারত।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

পত্রলেখকের প্রতি আবেদন

পত্র লেখকদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে অনধিক দুশো শব্দের মধ্যে লিখিত চিঠি পাঠান। পৃষ্ঠার একদিকে লিখবেন। অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। আশা করি স্বস্তিকার মানোন্নয়নের স্বার্থে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

চিঠিপত্র

সামাজিক চিকিৎসা চাই

ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের নাম নব্য ধাত্রীসমাজের এক অংশ ভুলে গেছে। তাই সেবার মন্ত্র আজ শয়তানীরূপে এন আর এস কলেজের ধাত্রীবিদ্যার ছাত্রীদের একাংশের মধ্যে দেখা গেল। এ চরিত্র তাদের পেশাগত চরিত্রের বিপরীত, যদিও বাংলায় এরূপ চরিত্রের আজ রমরমা। বাংলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার মানও তাই এত নিম্নগামী। বিষয়টি অতি দুঃখের। ঠিক যেন বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ক্ষুদ্র এক প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন রকমের উৎকোচ বা সিন্ডিকেটরাজ ফি না দিলে চাকুরি বা অন্যান্য অনেক সুযোগ এ রাজ্যে পাওয়া যায় না। এখানে সরকার বিরোধী চিন্তা বা বহুমতবাদকে যেমন বিষ চোখে দেখে, তেমনি প্রচলিত সংবাদপত্র বা 'শ্রী' পদবিধারী বুদ্ধিজীবীগণও ওদের সহ্য করতে পারে না।

হাসপাতালের সারমেয়রা নোংরা পরিষ্কার করলেও ওদের উৎপত্তি কিন্তু পরিবেশের পক্ষে খারাপ নয়। ডাস্টবিনের নোংরাকে এই সারমেয়রাই পরিষ্কার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালো রাখে। যদিও সারমেয়রা অযাচিত উৎপাত না করলেও হাসপাতালে এদের উপস্থিতি না থাকলেই ভালো। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যেমন কারণ আছে, বাংলায় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিও সামান ক্ষতিকর।

এর ফলে জনবিন্যাসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার, সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুদের নিরাপত্তা, দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত সুরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর ইসলামিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত নয় হিন্দু ভারতকেই।

মোটকথা, সর্বোপরি হাসপাতালে সারমেয় বৃদ্ধি এবং বাংলার মুসলমান সংখ্যা

বৃদ্ধি দুই-ই সমান খারাপ। সারমেয়দের নির্বীজকরণের কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার ফলেই পশ্চিমবাংলা আকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ থাকলেও প্রকৃতিতে মিনি পাকিস্তানের রূপ নিতে শুরু করেছে, সরকারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই। এ বড়ো দুর্দিন। আমরা আজও কি ঘুমিয়ে থাকব?

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

ভূপেন পুত্র গোড়ায় কমিউনিস্ট আগায় এন আর আই

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সাহিত্য কথাটির অর্থ সহিতের ভাব। সহজ করে বললে যার অর্থ, সঙ্গে থাকা। মানুষের সঙ্গে থাকা। এবং সঙ্গে থেকে মানুষের সঙ্গে গভীর ভাবসম্বন্ধ গোড়ে তোলাই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য। কথাটি সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে বলা হলেও অন্য ক্ষেত্রের শিল্পীদের প্রসঙ্গেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কারণে বাখ, মোৎসার্ট, বিঠোভেনের সংগীত রসিক ভারতীয়ের প্রাণে হিল্লোল তোলে। আবার হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হয় বহির্বিশ্ব। ভাবসম্বন্ধ একবার স্থাপিত হলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক স্বার্থ— কিছুই তাকে পঙ্গু করতে পারে না।

এত কথা লিখতে হলো শুধু একজনের জন্য। তিনি, ভূপেন হাজারিকার পুত্র তেজ হাজারিকা। সকলেই জানেন এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়াত ভূপেন হাজারিকাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদান করেছিল। খবরটি শুনে ভূপেনের এন আর আই পুত্র তেজ হাজারিকা কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে 'মানবতার জয়' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরই তিনি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বললেন। এখন তার বক্তব্য এই রকম : নাগরিকত্ব বিলের মতো একটি জনবিরোধী উদ্যোগকে অসম-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই ভূপেন হাজারিকাকে পুরস্কার দিতে চায় কেন্দ্র। অর্থাৎ ভূপেন হাজারিকাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা শোনার পর কেন তিনি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে মানবতার জয় বলে ব্যাখ্যা করলেন? আর কেনই বা এক সপ্তাহ পর একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওই একই সিদ্ধান্তের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন মোদী সরকারকে? তেজ কি জানতেন না যে যাদের বদান্যতায় 'মানবতার জয়' সূচিত হয়েছে তারাই অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণে সচেষ্ট। নাকি তখনও তার কাছে কমিউস্ট হেড কোয়ার্টার থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি? কথাটি উঠছে তার কারণ গুরুতর কিছু না ঘটলে বদ্ধ উন্মাদও এভাবে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না। একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। ১৯৭৫ সালে তেজের বয়েস কত ছিল? বছরটা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য সকলের কাছে নিন্দিত। কিন্তু হাজারিকা পরিবারের কাছে বন্দিত। কারণ ওই বছর ভূপেন হাজারিকা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিয়েছিল দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার। না, ভূপেন পুরস্কার গ্রহণ করতে আপত্তি করেননি। তেজও চুপচাপ বসেছিলেন। কিন্তু মোদী সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার নিতে তার ঘোরতর আপত্তি। সংগীতের মাধ্যমে ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে দেশের মানুষের যে ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তেজ তা নষ্ট করে দিলেন। নিজের হাতে খুন করলেন তাঁর শিল্পী পিতাকে।

—শবরী চক্রবর্তী,
হাওড়া।

কাঁচা লঙ্কাএবং লাল লঙ্কার কাহিনি

গত ১৭.১২.১৮ তারিখের এক বাংলা পাক্ষিকের 'কেয়া বাত' কলমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি মন্তব্য— ''রাহুল গান্ধী লাল আর সবুজ লঙ্কার তফাত জানেন না। আপনি যদি ওঁকে বলেন যে, লাল লঙ্কায় বেশি দাম পাওয়া যায়। তাহলে হয়তো উনি বলবেন শুধু লাল লঙ্কার ফলনই করতে''— প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয়, ওই মন্তব্যের মূলে রয়েছে তিন দশকের আগেকার একটি ঘটনা।

রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৯৮৫ সালের নভেম্বর- ডিসেম্বরে প্রথম গুজরাট সফরে গিয়েছিলেন। গুজরাটের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে— সেখানে পিঁয়াজ ও লঙ্কার চাষ বিশেষভাবে হয়ে থাকে। বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক ইন্ডিয়া টু ডে তাঁর সফর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল— প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর গাড়ি এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল, যার দু'পাশে লঙ্কার ক্ষেত। ক্ষেতের মধ্যে মাঝে মাঝে পাকা লঙ্কার উপর জাল বিছানো, যাতে পাখিরা ঠোকরাতে না পারে। রাজীব গাড়ি থেকে নেমে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন। কাঁচা লঙ্কার গায়ে হাত বুলিয়ে লোকজনদের জিজ্ঞেস করলেন কাঁচা লঙ্কার দাম প্রতি কিলোগ্রাম কত করে। তাঁরা একটি অঙ্ক উল্লেখ করলেন। তারপর রাজীব গান্ধী জাল বিছানো লাল লঙ্কার দাম জিজ্ঞেস করলেন। জবাব শুনে তিনি বুঝলেন যে কাঁচা লঙ্কার চেয়ে লাল লঙ্কার দাম প্রতি কিলোয় ১৫/২০ গুণ বেশি।

এবার তরুণ নেতৃত্বের প্রতিনিধি রাজীব গান্ধীর মন্তব্য ছিল, why the farmers do not produce red chillies instead of green chllilies.(সূত্র : বর্তমান, তাং ১৯.২.২০০৯)।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

শোক সংবাদ

স্বস্তিকা পত্রিকার লেখক অর্ণব নাগের পিতৃদেব অসিত কুমার নাগ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন।

সামাজিক বিকৃতি দূর করতে পারেন মহিলারাই

সুষমা স্বরাজ

বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে নারী কুম্ভের আয়োজন করা এক অসাধারণ ব্যাপার। কারণ এই ভূমি শক্তিভূমি। প্রতীক এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও শক্তিরূপিণী। কিন্তু আমরা যারা এখানে একত্রিত হয়েছি— সমাজে যে সকল বিকৃতি রয়েছে সেগুলিকে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা দূর করতে হবে। সামাজিক বিকৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কিছু পরিবারে কন্যাসন্তান জন্মের সম্ভাবনা এলেই তা নষ্ট করে দেওয়া হয়। তাকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। কন্যাভ্রূণ হত্যা আজ মেয়েদের ক্ষেত্রে অভিশাপ স্বরূপ। কত অভাগী কন্যা সন্তানকে গর্ভেই মেরে ফেলা হয়। আমাকে এই মানসিকতা ও কাজ খুব পীড়া দেয়।

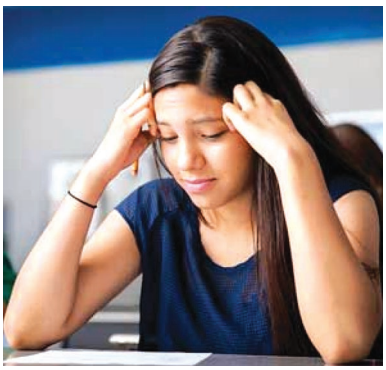


এই দেশে বছরে দু'বার নবরাত্রি পালিত হয়, শক্তির আরাধনা করা হয়। শ্রীরামের জন্য একদিন রামনবমী পালিত হয়, কৃষ্ণের জন্য একদিন জন্মাষ্টমী এবং শিবের জন্য একদিন শিবরাত্রি পালিত হয়। কিন্তু শক্তিরূপিণী মা দুর্গার জন্য দুবার ন'দিন করে অর্থাৎ আঠারো দিন আরাধনা করা হয়। আবার নবমীতে কুমারীপূজা করে সমাপ্তি হয়। আমরা প্রতিবেশী বাড়ির কন্যাকে নবরাত্রির প্রথমদিনে নিজেদের বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করি। যখন প্রতিবেশী কন্যা বাড়িতে আসে প্রথমেই তার পা ধুইয়ে বন্দনা করা হয়। মাথায় অক্ষয় তিলক লাগিয়ে হালুয়া, পুরি খাইয়ে দক্ষিণা দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করি—'যা দেবী সর্বভূতেষু কন্যারূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ... নমঃ নমঃ।' আবার দুঃখ হয় যখন দেখি পুত্রবধূ গর্ভবতী হলে পুত্রকে ডেকে মা বলছে— 'পরীক্ষা করে দেখ, গর্ভে কন্যাসন্তান থাকলে গর্ভপাত করিয়ে দাও।' প্রতিবেশী কন্যা দেবী, শক্তি, আর নিজের ঘরের কন্যা অবাঞ্ছনীয়। এটা এই দেশের বড়ো বিচিত্র ব্যাপার। এই জন্যই প্রধানমন্ত্রী 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান চালাচ্ছেন। এই সমস্ত কার্যক্রম কেবল সবকারি কার্যক্রম নয়। দীর্ঘদিন ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে অনেক সমিতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর লিঙ্গানুপাত কম হয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়কে এক অভিযানের রূপ দিয়েছেন। এবং যে রাজ্যে বেশি সমস্যা— হরিয়ানা, সেখান থেকেই শুরু করেছেন। ওই রাজ্যে এমনই কিছু জেলা ছিল যেখানে কন্যা জন্মানোর পর দুঃখ প্রকাশ করার প্রথা ছিল। প্রতিবেশী ঠাকুমাকে দিয়ে বলানো হতো— 'ভাববার কিছু নেই, পরে ভগবান ঠিক করবেন। এবারে মেয়ে হয়েছে, পরের বারে ছেলে হবে। নাতি ঘর আলো করবে।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অভিযানের পর অবশ্যই সামাজিক পরিস্থিতি বদল হয়েছে। হরিয়ানা ও অন্য কিছু জায়গাতে প্রথা আছে যে ছেলের মা চল্লিশ দিন পর কুঁয়ো পূজন করতে পারবে। এই অধিকার শুধুমাত্র ছেলের মায়েরই, মেয়ের মায়ের নয়। অহই ব্রত কেবল ছেলে মা-ই রাখতে পারে, মেয়ের মা নয়। কিছুদিন পূর্বে আমার কাছে গুরুগ্রাম থেকে একটি নিমন্ত্রণপত্র এসেছে যেখানে মেয়ের মায়েদের দ্বারা কুঁয়াপূজন সমারোহ সম্পন্ন হয়েছে। এখন পরিস্থিতির বদল হচ্ছে। কারণ 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'— জন-আন্দোলনে রূপ নিয়েছে, সরকারি কার্যক্রম মাত্র নয়।

আমি সকলকে বিশেষত, মহিলাদের বলতে চাই যে, এই সমস্ত সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মহিলাদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমত, অতীতে সংসারে পরিবার প্রথা খুবই মজবুত ও স্বাভাবিক ছিল। তার কেন্দ্রে মহিলাই ছিলেন। বর্তমানে সংসার ভেঙে ছোটো হয়ে যাচ্ছে এবং তার কারণ হলো 'তোমার ও আমার' ভাবনার প্রাধান্য। এর জন্যই সংসারে একতা থাকছে না। গীতার ১ম শ্লোকের ভাবার্থ অনুসারে— 'ধৃতরাষ্ট্র যখন সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্রের পরিস্থিতি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন সঞ্জয় 'আমার ও পাণ্ডু পুত্রের' এই শব্দ প্রয়োগ করেছিল। যখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে কৌরবদের নিকট পাঁচটি গ্রাম দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। সে সময় যদি মাতা গান্ধারী নিজভূমিকা পালন করে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতেন তাহলে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হতো না। আমি জানি, পারিবার ব্যবস্থা ঠিক রাখার দায়িত্ব মহিলাদের উপর। পরিবারের সকলকে একই বাড়িতে থাকা বাধ্যতামূলক নয়। চাকুরি বা ব্যবসাসূত্রে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হতে পারে। একই শহরে আলাদা বাড়িতে বাস করতে পারে কিন্তু পরিবার ব্যবস্থার অর্থ হলো সুখেদুঃখে সকলেই এক থাকবে। এরকম উদাহরণ যুধিষ্ঠির দিয়েছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে একবার গন্ধর্বগণ কৌরবদের উপর আক্রমণ করেছিল। যুধিষ্ঠির ভাইদের বললেন যে, গন্ধর্বসেনা কৌরবদের আক্রমণ করে, তাদের মুক্ত করতে হবে।

অর্জুন ও ভীম আশ্চর্য হয়ে বলল— এ আপনি কী বলছেন? ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমরা ওদের মারতে চাই। দ্বিতীয়ত, কোনো শত্রু যখন ওদের মারতে আসছে— তখন ওদের আমরা সাহায্য করব? মরতে দিন ওদের। তখন যুধিষ্ঠির বললেন— না, আমরা যখন নিজেদের মধ্যে লড়ছি তখন ওরা একশো আমরা পাঁচ। যখন বাইরের শত্রু আক্রমণ করেছে তখন আমরা একশো পাঁচ। পরিবার ও সমাজে মহিলাদের এই রকম ভূমিকা পালন করতে হবে।

(বৃন্দাবনে নারীকুম্ভে প্রদত্ত ভাষণ)



লড়াই করে ছিনিয়ে নিতে হবে চাকরি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

জীবনের যে কোনও লক্ষ্যকে পূরণ করার জন্য পরিমিত মাত্রায় আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ সঠিক আত্মবিশ্বাসের অভাব। এটি খানিকটা ছোঁয়াচে রোগের মতো যা প্রস্তুতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাপ ফেলে। বার বার পড়েও ভুলে যাওয়া, সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করা, নেগেটিভকে নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হওয়া, সঠিক অপশন নির্ণয় করতে ব্যর্থ হওয়া— ইত্যাদির কারণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। বহু পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যায় কেবলমাত্র সিলি মিসটেকের জন্য। এর জন্য দায়ী অতি অবশ্যই আত্মবিশ্বাস, তা সে 'অভাব' হতে পারে কিংবা 'আধিক্য'ও হতে পারে। একটা ব্যাপার অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে আত্মবিশ্বাসের অভাব খারাপ, কিন্তু ওভার কনফিডেন্স পতন ডেকে আনে। এটি খানিকটা ব্লাড প্রেসারের মতো। সঠিক বইপত্রের অভাব, পড়াশোনার খামতি বা সময় বার করতে না পারা, কিংবা বিশাল সিলেবাসে প্রস্তুতি যখন সঠিকমাত্রায় থাকে না— তখন আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা যায়। আবার বন্ধুবান্ধবদের কর্মজীবনে দ্রুত অগ্রগতি নিজের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। নিয়ে আসে হতাশা ও অবসাদ। হীনমন্যতা বা ইনফিরিওটি কমপ্লেক্স থেকে জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাসের অভাব।

সাধারণত প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েরা এ ঘটনার শিকার হয় বেশি। এরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সঠিক গাইডেন্স তো দূরের কথা বইপত্তরও পায় না। সঠিক দিশার অভাবে তারা সচরাচর গুটিয়ে থাকে। গ্রাম থেকে পরীক্ষা দিতে এসে শহরের জাঁকজমক দেখে পরীক্ষা কেন্দ্রে বসে মাথা কিছুটা গুলিয়ে যায়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ১০ থেকে ৩০-৪০টি নেগেটিভ করে বসে। অনেকে আবার আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলে উত্তরপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করতেই ভুল করে। তাহলে এর সমাধান কী হবে? একটা কথা সকলকে মনে রাখতে হবে— রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চোখে সকলেই সমান। নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকলেই পরীক্ষায় বসা যায়। কোনো বিখ্যাত স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করলে যে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে তা নয়। তাই গ্রামের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করেছি বলে টেনশন নেওয়ার কিছু নেই, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। গ্রামের ছেলেমেয়েরা অভিযোগ করে যে প্রত্যন্ত জায়গায় ঠিক মতো গাইডেন্স, বইপত্র, ম্যাগাজিন পাওয়া যায় না। অথচ ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শহরে গাইডেন্স দেওয়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। কিন্তু কোর্স ফি যতটা চড়া, গাইডেন্সের মান ততটাই নিম্নগামী। ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা দু'রকম ভাবে উপকৃত হয়, এক তাদের কষ্টার্জিত বিপুল অর্থের অপচয় ঘটল না, দুই, তারা মিসগাইডেড হলো না। এ দুটির কারণে তাদের নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিত।

আত্মবিশ্বাস লাভের জন্য যারা সাফল্য পেয়েছে তাদের পরামর্শ নিতে হবে— কী বই, ম্যাগাজিন বা, নোটস তারা পড়েছেন, তাদের সাফল্যের কারণগুলি কী ইত্যাদি। সদ্য পাশ করা বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, সিডিপিও, রেভিনিউ কিংবা অন্যান্য বিভাগীয় অফিসাররা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সহজলভ্য। গ্রামে থাকি, কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না বলে বিলাপ না করে সত্বর তাদের সাথে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় নয় কি? আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, সবাই তো আর সোনার চামচ মুখে করে জন্মায় না। লড়াই করেই ছিনিয়ে নিতে হবে নিজের চাকরিটাকে। লক্ষ্য থাকবে অবিচল, আর তার জন্য দৃষ্টি লক্ষ্যে থাকবে স্থির। যত ঝড় ঝাপটাই আসুক না কেন ফোকাসচ্যুত হবে না তোমাদের দৃষ্টি। পরিশেষে একটি উপদেশ দেওয়া যেতে পারে, যারা এরকম আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছো— তারা অবশ্যই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি এড়িয়ে চলো। তাতে দাদা-দিদি বা বন্ধু বান্ধবদের গ্ল্যামারাস জীবন দেখে নিজেকে অযোগ্য নিকম্মা ভাবতে হবে না।

আত্মবিশ্বাসের আরেকটি দিক হলো— অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। এটি আরও বিপজ্জনক। বিশেষত নাম করা স্কুল কলেজ পড়া বিজ্ঞান বা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিষয়টি বেশি অবলোকন করা যায়। এরকম অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস— এর কারণ পরীক্ষাটিকে আন্ডার এস্টিমেট করা। কোনো চাকরির পরীক্ষা সহজ হতে পারে, তথাপি এটিকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। তাহলে সাবধান। সাবধান আর কিছুই নয়, পরীক্ষার্থী মেগালোম্যানিয়াক না হয়ে মাটিতে পা রেখে চললেই হলো। ■

ভারতের লড়াই দু-তরফেই



পাকপ্রেমী কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধুর এই মঞ্চ থেকেই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ওপর পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব শোকে নির্বাক হয়েছে। এহেন কাপুরুষোচিত এবং বর্বরোচিত হামলার ঘটনার নিন্দা করার ভাষাও কারো নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতিমধ্যেই আওয়াজ উঠেছে— পাকিস্তানকে এবার সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, আপনাদের বুকে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন আমার বুকেও জ্বলছে। পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুলওয়ামার ওই জঙ্গি হামলার পর এই আবহে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কেমন? এই ঘটনার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা শোক প্রকাশ করেছেন। না করে অবশ্য তাদের উপায়ও ছিল না। এমনিতেই তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে, তাদের দেশপ্রেম নিয়েও মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। ফলে, এখন অন্য কোনোরকম আচরণ করলে দেশের মানুষ পুরোপুরি তাদের বর্জন করত— একথা বেশ ভালোভাবেই বোঝেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। অতএব, শোক প্রকাশ করে দায় সেরেছেন তারা। তবে, কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না। কাজেই বিরোধীরা প্রাথমিক ভাবে শোকপ্রকাশ করলেও, এই জঙ্গি হানার ঘটনার তিনদিনের মাথাতেই তারা তাদের প্রকৃত পরিচয় চিনিয়ে দিয়েছে। জঙ্গি হানার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় বৈঠকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব এনেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দেওয়ার, তখন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি এবং বামপন্থীরা সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার কোনো রকম কড়া পদক্ষেপ করুক তা তাদের না-পসন্দ। যদিও ওই বৈঠকে বিজু জনতা দল এবং শিবসেনা কেন্দ্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। ওই সর্বদলীয় বৈঠকেই বিরোধী দলের নেতারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান সম্পর্কে তাদের মনোভাব কতখানি নরম। সমগ্র দেশ যখন পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দাবি করছে, তখনও দেশবাসীর এই আবেগকে অগ্রাহ্য করেই এই বিরোধী নেতারা পাক প্রেমে নিমজ্জিত থাকাকেই বেশি শ্রেয় মনে করেছেন। এদের এই মানসিকতাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গত সাত দশকে বিশ্বের সামনে ভারতকে এক



জে এন ইউ-এ পাকিস্তানপ্রেমীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, আনন্দ শর্মা, সি পি এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি (বক্তব্য রাখছেন)।

কাপুরুষ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এদের এই মানসিকতার জন্যই পাকিস্তান এবং চীনের মতো শত্রুরাষ্ট্র ভারতের ভূমি দখল করার অপপ্রয়াস চালাতে সাহস পেয়েছে। এদের পাকিস্তান প্রেমের কারণেই ভারতের ভিতর পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেস, সিপিএম-সহ এই বিরোধীদের পাকিস্তানও তার স্বাভাবিক মিত্রই মনে করেছে। যে কারণে পাক রাজনীতিকরা খোলাখুলিই প্রকাশ্যে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য আবেদন করেছেন। প্রত্যুত্তরে, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী আগাম জানিয়ে রেখেছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানকে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হবে। এরও আগে রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেস নেতারা নয়া দিল্লিতে পাক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ারের বাড়িতে। এই মণিশংকর আইয়ার পাকিস্তানে গিয়ে ভারতের নিন্দা করে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সফাই গেয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। পুলওয়ামার ঘটনার পর কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধু প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সাফাই গেয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। সিধুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বলে শোনা পায়নি। কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রেম অবশ্য নতুন কিছু নয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে মহম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের রাজকোষ থেকে সেই পাকিস্তানকে ৫০ কোটি টাকা দান করার দাবিতে অনশনে বসেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাক সেনারা যখন অন্যায় ভাবে কাশ্মীরের একটি অংশ দখল করে, তখন সেই দখলদারি পাক বাহিনীকে ভারতীয় সেনা সরিয়ে দিতে উদ্যত হলে, কোনো এক রহস্যজনক কারণে জওহরলাল নেহরু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরে আসার নির্দেশ দেন। সেই থেকে দীর্ঘ সাত দশক ওই ভূখণ্ড পাক অধিকৃত কাশ্মীর হয়েই রয়েছে। এর চেয়ে স্বাভাবিক মিত্র সারা বিশ্ব ঘুরেও পাকিস্তান আর কোথায় পাবে? পাকিস্তান এবং কংগ্রেস দুতরফেরই একটিই উদ্দেশ্য— তা হলো, দিল্লি থেকে নরেন্দ্র মোদীকে সরাও। পাকিস্তান নরেন্দ্র মোদীকে সরাতে চাইছে তার কারণ, গত চারবছরে নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করেছেন ভারতও শত্রুকে শায়েস্তা করার হিম্মত রাখে। নরেন্দ্র মোদীর সময়েই চীনের সঙ্গে সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে ভারত। কাজেই ক্ষমতায় মোদী থাকলে সমূহ বিপদ। ভারতের ভিতর জঙ্গি জাল বিস্তারের পুরো পাকিস্তানি ছকটাই বানচাল হয়ে যাবে তখন। অন্য দিকে কংগ্রেস। কংগ্রেস নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দিতে চায় না একটিই কারণে। কংগ্রেস জানে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় ফিরে এলে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত গান্ধী পরিবার এবং তার বশংবদদের দেশকে লুট করে খাওয়ার বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।



মানবাধিকারের নামে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর অপচেষ্টা ছদ্মবেশীদের।

কংগ্রেসের মতোই সম পরিমাণে পাকিস্তান প্রেম রয়েছে বামপন্থীদের হৃদয়েও। দেশভাগ পর্ব থেকেই সেই পাকিস্তান প্রেমের পরিচয় বারে বারেই দিয়ে গেছে বামপন্থীরা। দেশভাগ পর্বে এই বামপন্থীরাই আওয়াজ তুলেছিল— আগে পাকিস্তান দিতে হবে, পরে ভারত স্বাধীন হবে। অবশ্য এরা চীন প্রেমও কিছু কম দেখায়নি। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে এই চীনাপন্থী বামপন্থীরাই ভারতকে 'আক্রমণকারী' আখ্যা দিয়েছিল। এবারও পুলওয়ামায় নৃশংস জঙ্গি হামলার পর সিপিএম এবং সিপিআই— এই দুই বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কোনো মতেই পাকিস্তানের ওপর প্রত্যাঘাত করা চলবে না। তদুপরি, সিপিএমের দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'তে লেখা হয়েছে— 'যুদ্ধের জিগির তুলে ভোটে জেতার চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র



- পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য বলিউডের অভিনেতা অক্ষয়কুমার ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। অমিতাভ বচ্চন দিয়েছেন আড়াই কোটি। শাহরুখ খান তিন লক্ষ।
- দেওয়াশি মানেক হিরে ব্যবসায়ী। পুলওয়ামায় নিহত জওয়ানদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য মেয়ের বিয়ের আড়ম্বর কাটছাঁট করে ১১ লক্ষ টাকা দিয়েছেন দেওয়াশি। এছাড়া আলাদা করে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন নিহতদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় খরচ করার জন্য।
- মুশকান আহিরওয়ার, বয়স এগারো, বাড়ি ভূপালে। তার জন্মদিনের জন্য জমানো ৬২৮ টাকা সে তুলে দিয়েছে জেলা সৈনিক কল্যাণ তহবিলে।



মোদী।' এই একটি লেখাতেই প্রকাশ, এরকম একটি ঘৃণ্য জঙ্গি হামলা থেকে কী সুকৌশলে এবং মিথ্যা প্রচারে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছে বামপন্থীরা।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বামপন্থীরা বরাবরই পাকিস্তান এবং পাকপন্থী জঙ্গিদের যে মদত দিয়ে যাচ্ছে, তার নানাবিধ প্রমাণও ইতিউতি ছড়িয়ে আছে। যেমন, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্ররা আওয়াজ তুলেছিল 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ।' কাশ্মীরি জঙ্গি আফজল গুরুর ফাঁসির পর এরাই আফজলের ছবি নিয়ে শোকমিছিল করেছিল। এদের পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছিলেন, সিপিআই-সিপিএম নেতারা।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও অবশ্য এসেছিলেন। তখন কেউ প্রশ্ন তোলেননি, 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' এই স্লোগান যারা দিচ্ছে, তারা কারা? বামপন্থীদের নতুন আইকন কানহাইয়া কুমার প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, 'যারা স্কুলে ক্লাস টেনের গণ্ডি ডিঙোতে পারে না, তারাই জওয়ান হয়।' যে জওয়ানরা নিজের জীবন বিপন্ন করে সীমান্তে দেশ পাহারায় নিযুক্ত, তাদের সম্বন্ধে এত ঘৃণ্য মন্তব্য ইতিপূর্বে কেউ করেনি। ভবিষ্যতেও কেউ করবে বলে মনে হয় না।

তবে সব থেকে সরেস পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান তোষণের রাজনীতি এখন সর্বজনবিদিত। এত নগ্ন ন্যাক্কারজনক তোষণের উদাহরণ এর পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। সে নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করে লাভ নেই। এহেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার পুলওয়ামার হামলার পর তাঁর বিবৃতিতে বললেন, 'কোনো তদন্ত না করেই পাকিস্তানকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।' হুবহু প্রায় একই কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। কীসের তদন্ত আর কীসের প্রমাণ চান মমতা আর ইমরানের মতো রাজনীতিকরা? পুলওয়ামার হামলার দায় স্বীকার করেছে জয়েশ-ই- মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠন। ওই সংগঠনের নেতা মাসুদ আজহার নিশ্চিন্তে পাকিস্তানের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছে। এবং সমগ্র বিশ্ব জানে জয়েশ-ই-মহম্মদ নামক এই সংগঠনটি পাক সেনাবাহিনীর মদতপুষ্ট। তারপরও মমতা আর ইমরান কী প্রমাণ চাইছেন? কোন সত্যকে আড়াল করতে চাইছেন ওরা।

পুলওয়ামার এই জঙ্গিহানার পর সারা দেশ যখন ক্ষোভে উত্তাল, দিকে দিকে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের প্রকাশ দেখা দিচ্ছে, তখন মমতা বলে বসলেন, আর এস এস এবং বিজেপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রীকে সবিনয়ে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, ২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের দাবিতে পাকসার্কাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটি এখন তার দলের সংসদ সদস্য। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন সিমি-র এক নেতাকে তিনিই রাজ্যসভায় তার দলের সাংসদ হিসাবে পাঠিয়েছেন। ২০১১ সালে দেগঙ্গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল পাণ্ডাটি ছিল তারই দলের সংসদ সদস্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নালিয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারই মন্ত্রীসভার এক সদস্য। ধর্মতলায় পুলিশ পিটিয়েছিল যে সংখ্যালঘু সংগঠনের সদস্যরা, তাদের নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার সদস্য। কে কোন উদ্দেশ্যে কাকে আড়াল করতে চাইছেন— তা দেশবাসীর কাছে কিন্তু পরিষ্কার।

আসলে ভারতের লড়াইটা দুতরফে। ঘরে এবং ঘরের বাইরে। পাকিস্তান বহিঃশত্রু। তাকে চিনে নেওয়া সহজ। কিন্তু ঘরের ভিতরের শত্রুরা? লড়াইটা তাদের বিরুদ্ধেও জোরদার চালাতে হবে ভারতকে। ■



- কূটনৈতিক স্তরে ভারতের জয় এল। এই প্রথম সংযুক্ত রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ সরাসরি জৈস-এ-মহম্মদ এবং তার নেতা মাসুদ আজহারের নাম উল্লেখ করে পুলওয়ামা আক্রমণে এদের ভূমিকার উল্লেখ করেছে। এই সন্ত্রাসবাদী কাজের কড়া নিন্দাও করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত পাকিস্তানকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এই সুবিধা থাকার ফলে অপেক্ষাকৃত কম দামে ভারতীয় পণ্য আমদানি করতে পারত পাকিস্তান। পুলওয়ামার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারত এই সুবিধা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।
- জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সবরকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের সরকারি নিরাপত্তারক্ষীও তুলে নেওয়া হয়েছে।
- পাকিস্তানী শুটারদের ভারতে আসার ভিসা না দিয়ে ক্রীড়াজগতেও পাকিস্তানকে একঘরে করার প্রক্রিয়া শুরু করল ভারত। উল্লেখ্য, ভারতে আন্তর্জাতিক শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- সিন্ধু নদের জলপ্রবাহ আটকে পাকিস্তানকে জল সরবরাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করছে ভারত। এর ফলে কৃষিকাজে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে পাকিস্তানকে।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার কাছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে পাকিস্তানকে বাদ দেবার আবেদন করার প্রস্তুতি শুরু করেছে পাকিস্তান। আবেদন মঞ্জুর হলে এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান অংশগ্রহণ করতে পারবে না। প্রসঙ্গত, আগামী জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসার কথা।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিভাজনই রুখতে পারে পাক সন্ত্রাসবাদকে

সনাতন রায়

কাশ্মীরে পাক সন্ত্রাস নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই নানারকম সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। এইসব সমালোচনা মূলত উঠছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকেই। সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং মুখ্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ মোদীর বিরুদ্ধাচারণ করে ভোটের আগে সরকার বিরোধী হাওয়ায় বাতাস করা। দুর্ভাগ্যবশত, এই সমালোচনার শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং শাসক দল। কারণ তাদের সব রাজনৈতিক খেলা, সাম্প্রদায়িক ভোটের অঙ্ক এবং দুর্নীতির নেপথ্য কাহিনি প্রধানমন্ত্রী ধরে ফেলেছেন।

প্রশ্ন হলো, যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁরা কি কাশ্মীরের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল? তাঁরা কি জানেন, জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যটির গরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান নন, হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়? তাঁরা কি জানেন, জনসংখ্যার ভারসাম্যের হিসেবে পাকিস্তান কখনই কাশ্মীরকে তাদের জমিদারি বলে দাবি করতে পারে না শুধু এই অজুহাতে যে কাশ্মীর মুসলমানদের স্বর্গরাজ্য। তাঁদের কাছে কি এই তথ্য আছে যে জম্মু এবং কাশ্মীরের ২২টি জেলার মধ্যে মাত্র পাঁচটি জেলা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক এবং সমস্যার তীব্রতা শুধু এই পাঁচটি জেলাতেই? বাকি সব জেলাই ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী? যদি না জানা থাকে, তাহলে তাঁদের পরামর্শ দেব নীচের তথ্যগুলি পড়ে অনুধাবন করতে এবং তারপর সমালোচনার বাণী ছড়াতে। কারণ মনে রাখতে হবে, কিছু মানুষের অজ্ঞতার জন্য গোটা দেশকে বিপন্নতার পথে ঠেলে দেওয়া যায় না। ওইসব অজ্ঞ মানুষের উচিত, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা অথবা দেশদ্রোহিতার নামাবলী গায়ে দিয়ে সীমান্ত পার হওয়া।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মোট আয়তন ১০১৩৮০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ধরা হচ্ছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকেও যা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে দখল করে রেখেছে পাকিস্তান শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরে যখন তখন সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর সুবিধার জন্য। এই ১০১৩৮০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এলাকা লাদাখে— ৫৯ শতাংশ। মোট আয়তনের ২৬ শতাংশে রয়েছে জম্মু আর কাশ্মীরের অবস্থান মাত্র ১৫ শতাংশ জুড়ে। এ থেকে একটা উপসংহারে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা নেই যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে কাশ্মীরের অবস্থান। এর চেয়ে বড়ো তথ্য হলো, ১০১৩৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ৮৫,০০০ বর্গ কিলোমিটারে মুসলমান জনসংখ্যা থাকলেও তা যৎসামান্যই। বলা চলে ৮৫ শতাংশ অঞ্চলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো হিন্দু জনসমাজ।

জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ। এর বাইরেও রয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ যারা ভারতবর্ষের নাগরিকই নয় অর্থাৎ এরা মূলত অনুপ্রবেশকারী। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব রয়েছে এমন ১ কোটি ২৫ লক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর নিবাসী জনগণের মধ্যে কাশ্মীরে বসবাস করেছেন ৬৯ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ৫৬ লক্ষ মানুষ কাশ্মীরী ভাষায় কথা বলে। বাকি ১৩ লক্ষের ভাষা অন্য। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে এই ১৩ লক্ষ মানুষ কাশ্মীরি নন। জম্মুতে বসবাস করছেন ৫৩ লক্ষ মানুষ। এদের বেশিরভাগ কথা বলেন স্থানীয় ডোগরি ভাষায়। তাছাড়া রয়েছেন হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষার মানুষ। লাদাখের জনসংখ্যা সবচেয়ে কম। মাত্র তিন লক্ষ। এরা লাদাখি ভাষায় কথা বলেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে এ রাজ্যে কাশ্মীরি ভাষার আধিপত্যও যথেষ্ট কম।

জম্মু ও কাশ্মীরে রয়েছে ২২টি জেলা। ওই ২২টি জেলার ১৭টি জেলাই কিন্তু উপদ্রববিহীন এলাকা। উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত মাত্র ৫টি জেলা। এগুলি হলো শ্রীনগর, অনন্তনাগ, বারামুল্লা, কুলগাম এবং পুলওয়ামা। লক্ষ্যণীয় এই পাঁচটি জেলাই পাকসীমান্ত বা নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে বহুদূরে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ এই জেলাগুলিতেই সবচেয়ে বেশি কারণ সন্ত্রাসবাদের কারিগর ও সমর্থনকারী সুন্নি মুসলমানগোষ্ঠী এই জেলাগুলিতেই বেশি, যদিও সামগ্রিক হিসাবে তাদের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। এই ১৫ শতাংশের মধ্যে আবার একটা অংশ ক্ষুদ্র হলেও সন্ত্রাসবাদের সমর্থক নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যারা আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে আজাদ কাশ্মীরে বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে, তাদের সংখ্যাটা মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি নয়। সমালোচকরা অবশ্য বলছেন, বিষয়টা এত সরল নয়। কারণ ওই পাঁচটি জেলায় সব মানুষই



সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যকারী। যদিও তাঁরা যা বলছেন না, তা হলো, যারা সাহায্য করছেন তাঁরাও সন্ত্রাসবাদেরই শিকার। ঠিক যেমনটি খলিস্তান আন্দোলনের সময় গোটা পঞ্জাববাসীর হয়েছিল। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যখন আন্দোলনের রাশ মূল নেতৃত্বের হাতের বাইরে চলে যায় এবং আন্দোলন মূলত সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখনও পঞ্জাবের সাধারণ অধিবাসীরা বাধ্য হতেন সন্ত্রাসবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে সায় দিতে। যারা মনে করেন, কাশ্মীর হলো মুসলমানদের, তাঁরা হয়তো জানেন না গোটা জম্মু এবং কাশ্মীরে ১৪টি সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এবং জনজাতি রয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ জুড়েই রয়েছেন এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। এরা কিন্তু একেবারেই ভারত-বিদ্বেষী নন। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তো আছেনই। এছাড়া রয়েছে রাজপুত, ব্রাহ্মণ, মহাজন (সামাজিক ভাবে এরা ডোগরা বলে পরিচিত), শিখ, লাদাখি (বৌদ্ধধর্মাবলম্বী), গুজ্জর, বকরওয়াল, পাহাড়ি, বাল্টি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্যরা।

ভারত-বিদ্বেষী হলো সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান জনগোষ্ঠী সহ কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলে এমন ৩৩ শতাংশ জনগণ। এই ৩৩ শতাংশ মানুষই হুরিয়ত থেকে সন্ত্রাসবাদ, ন্যাশনাল



কনফারেন্স থেকে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় বিষয় এবং রাজনীতি— সবই এদের নিয়ন্ত্রণে। অদ্ভুত ব্যাপার রাজ্যের আমলাতন্ত্র থেকে কৃষি সবই এদের দখলে। বাকি ৬৯ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে রয়েছে শিয়া ১২ শতাংশ, গুজ্জর মুসলমান ১৪ শতাংশ, পাহাড়ি মুসলমান ৮ শতাংশ। এরা কেউই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না এবং পাকিস্তানকে এরা শত্রু হিসেবেই মনে করে, ঠিক যেমনটি মনে করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট ৪৫ শতাংশ মানুষ। সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ, ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো, ভারত বিদ্বেষী স্লোগান তুলে মিছিল মিটিং— এ সবই ঘটে পাঁচটি উপদ্রুত জেলায়। অন্যত্র নয়। সীমান্তের অনেক কাছাকাছি এলাকা পুঞ্চ ও কার্গিল। এই দুটি অঞ্চলেই ৯০ শতাংশ জনগণ মুসলমান। কিন্তু এইসব এলাকায় দেশদ্রোহী কোনো ঘটনাই ঘটে না। শুধুমাত্র দেশবিরোধী কিছু গণমাধ্যম এবং ভারত-বিদ্বেষী কিছু কাশ্মীরির একটানা প্রচারের ফলে গোটা দেশবাসী ধরে নেয়— গোটা জম্মু ও কাশ্মীরই ভারতের বিরুদ্ধে।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রচারের প্রভাব পড়ছে সবচেয়ে বেশি জম্মুতে। মূলত ব্যবসায়ী এলাকা বলে চিহ্নিত জম্মুতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এরা তীব্র মোদী সমর্থক। প্রভাব পড়ছে লাদাখেও যেখানে মূল অর্থনীতিই পর্যটন-নির্ভর। শুধুমাত্র গোটা রাজ্যের ১৫ শতাংশ আয়তনের একটি ক্ষুদ্র অংশ আর কাশ্মীরের ৩৩ শতাংশ কাশ্মীরি ভাষাভাষীর মানুষের জন্যই ভুগতে হচ্ছে গোটা জম্মু এবং কাশ্মীরকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে আসছে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিভাজনের প্রশ্ন। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীর নামক জ্বলন্ত ইস্যুটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁরা জানেন, কিছু কাশ্মীরির পাপে বিদ্ধ হচ্ছেন জম্মু ও লাদাখের বিশাল জনগণ। জম্মু ও কাশ্মীরের যাবতীয় সুখ-সুবিধার প্রথম দাবিদার কাশ্মীর উপত্যকার কাশ্মীরিরা। তারা সস্তায় খাবার -দাবার পাবেন, শিক্ষা পাবেন, বাসস্থান পাবেন, চাকরি পাবেন, ব্যবসা করবেন আবার ভারত বিদ্বেষী স্লোগান তুলে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাও ওড়াবেন। ১৯৫১ সাল থেকেই এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে জম্মুর মানুষরা ভিখারীর মতো হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে খুদ-কুঁড়োর আশায়। জম্মুর শিক্ষিত যুবকদের ভিনদেশে যেতে হবে চাকরি করতে। সরকারি চাকরি পাবে শুধুই কাশ্মীরিরা। জম্মুতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয় না। কারণ কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ। একই হাল লাদাখেও।

তিনটি এলাকার সংস্কৃতি আলাদা, ভাষা আলাদা, জনচরিত্র আলাদা। জীবনযাত্রা আলাদা। পরিবেশ ও রাজনীতি আলাদা। তাহলে কেন একটি উপত্যকার যাবতীয় সমস্যার মুখোমুখি হবে গোটা রাজ্য?

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে তিনটি পৃথক রাজ্যে বিভাজিত করা হলে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হবে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার। কারণ তখন জম্মু এবং লাদাখের পৃথক সরকারি প্রশাসনের পক্ষে আলাদা আলাদা ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ানো সম্ভব হবে সামরিক বাহিনীর কাছে। কাশ্মীর উপত্যকার ওপর নজরদারিও সহজ হবে। বিদেশি অনুপ্রবেশও রোখা সহজ হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নিলে, একথা জানাই যে গোটা দেশের রাজনৈতিক বিরোধী শক্তিগুলি রে রে করে উঠবে এবং জোরদার প্রচার শুরু হবে— কেন্দ্র বিভাজনের রাজনীতি করছে। মুসলমানদের একঘরে করতে চাইছে। তখন কিন্তু কোনো বিরোধী শক্তিই বলবে না যে ওই মুসলমানরাই ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রোথিত করে পাকিস্তানকে ডেকে আনছে। তৈরি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের কারখানা। ভারতকে বাধ্য করছে যুদ্ধের পথে এগিয়ে যেতে। সমস্যাটা এখানেই। কারণ, ভারতবর্ষের একটি দুটি দল ছাড়া সমস্ত বিরোধী শক্তিরই মূল লক্ষ্য হলো সাম্প্রদায়িকতার তাস হাতে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতিতে অংশ নেওয়া এবং দেশকে চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া।

এব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শাসকদলের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পুলওয়ামা সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া কিছু মন্তব্যই প্রমাণ করে দেয়, তিনি মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশদ্রোহিতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিদেশি শত্রুকে মান্যতা দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে কঠোর পদক্ষেপে নিতেই হবে। ভোটাভুটি, রাজনীতির কথা ভুলে দেশরক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই। গোটা দেশবাসী তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই এক উপদ্রবহীন শান্তির ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে, যে ভারত ভারতবাসী দেখেনি স্বাধীনতার পর থেকেই। যে ভারত ভারতবাসী দেখতে চায় দুচোখ মেলে। ■

যুদ্ধ নয় আলোচনা চাই কিন্তু মধ্যস্থতা কে করবে ?



ড. জিষ্ণু বসু

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। পাকিস্তান বা কাশ্মীরের জেহাদিদের বিরুদ্ধে যে রণহুঙ্কার তার বিরুদ্ধে সকলে। সকলে মানে শাসকদল, বিরোধী বামফ্রন্টের সব্বাই, যারা ভারতের সংবিধানের প্রতি ততটা আস্থা না রাখলেও রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় সবাই। ওই অলপ্পেয়ে বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক শক্তি বলেছেন, বুলেট নয়, একান্ত আলোচনার মধ্যে দিয়েই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে।

'এরা কারা?' কিছু অশিক্ষিত, অসংস্কৃত যুবকযুবতী জাতীয় পতাকা নিয়ে, মোমবাতি নিয়ে মিছিল করছে। সঙ্গে বাংলা, ইংরাজি বা হিন্দিতে উগ্র দ্বেষাত্মক পোস্টার। এ রাজ্যের যত সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ, কবি, সাহিত্যিক সকলে এই মূঢ়মতিদের কাণ্ডে লজ্জিত ও আহত হয়েছে। এ রাজ্যে বুদ্ধিজীবীরা 'বুদ্ধিজীবী' ব্যানার লাগিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। কলকাতা বুদ্ধির জ্ঞানের সংস্কৃতির পীঠস্থান কিনা। সেই বুদ্ধিজীবীরাও নিন্দা করেছেন এইসব দেশভক্তির। এ কী অসভ্যতা।

কলকাতা সাংবাদিকতায় সবার আগে। এখানকার এগিয়ে থাকা সংবাদপত্র না পড়া মানেই তো পিছিয়ে থাকা! পেশাদার সাংবাদিকের মধ্যে দেশপ্রেম ব্যাপারটাই একটু গা-ঘিনঘিনে বিষয়! এইসব কাগজ কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত নিরীহ নাগরিকদের নিয়ে প্রথম পাতায় শিরোনাম ছাপায়। কাশ্মীরের জঙ্গির দেহ বাড়িতে এলে শহিদের মর্যাদা দিয়ে প্রথম পাতায় ছাপানো হয়। এইসব সংবাদমাধ্যমও নেমে গেছে এই হিংস্র যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিরুদ্ধে। একের পর এক উত্তর সম্পাদকীয়তে তুলোধোনা করা হচ্ছে দেশপ্রেমের।

'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইন্সাল্লাহ, ইন্সাল্লাহ' জপ করা প্রগতিশীল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও আছে। তাই পুলওয়ামার ঘটনার এক দুইদিনের মধ্যেই কলেজের সামনে, রাস্তা বন্ধ করে বা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই যুদ্ধের দামামার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভারত বিরোধিতার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, বাম, অতিবাম সব ছাত্র, শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সংগঠনের একেবারে অনড় দাবি! জওয়ানের মৃত্যু, এতগুলো তাজা প্রাণ চলে গেছে বলে আরও কিছু প্রাণ নিতে হবে?



সবাই তো চাইছেন আলোচনার মধ্য দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হোক। কিন্তু তার জন্য সমস্যাটাকে তো ভালো করে জানতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষ তার কথাটাও তো তুলে ধরা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটি পর্যায় এক একটি পক্ষ অবশ্যই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে পারে। আসলে এইসব বুদ্ধিজীবী, এত বড়ো বড়ো এগিয়ে থাকা খবরের কাগজ কতগুলো ইতিহাস, কিছু ভৌগোলিক সত্যকে সব সময় ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আগে সেই কথাগুলো সর্বস্তরে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কাশ্মীর একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। আদিল আহমেদ দার তার মৃত্যুর



অসহায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিজের দেশেই উদ্বাস্তু।

ছাড়া যেমন বাঙ্গালি হতে পারে না, তেমন অভিনব গুপ্ত বা কলহন ছাড়া কাশ্মীরের সংস্কৃতি হতেই পারে না।

কাশ্মীর মানে তো জম্মু কাশ্মীর রাজ্য। এই রাজ্যের ১,০১,৩৮৭ বর্গ কিলোমিটার ভূমিখণ্ডের মধ্যে মাত্র ১৫.৭৩ শতাংশ জমি জুড়ে কাশ্মীর উপত্যকা। ১৫.৯৩ শতাংশ জমি জম্মুর আর ৫৮.৩৩ শতাংশ জমিতে আছে লাদাখ। জম্মু আর লাদাখ মিলে রাজ্যের ৮৪.২৬ শতাংশ ভূমিখণ্ডের একজন মানুষও ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে চায় না। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও এই অঙ্কটা বোঝেন। তাই জম্মুর জনসংখ্যার বিন্যাস পরিবর্তন না হলে রাজ্য ভারত বিরোধী হবে না। এর জন্য সুদূর মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের জম্মুতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দিল্লিতে রীতিমতো অফিস করে ইউ এন এইচ সি আর-এর কার্ড বানিয়ে জম্মুতে পাঠানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও অর্থ আছে এর সঙ্গে।

আল জাজিরা গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সওকত সাফির লেখায় বিস্তৃত ভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে বৌদ্ধদের দ্বারা অত্যাচারিত রোহিঙ্গারা জম্মুতে একটু একটু করে নিজেদের অধিকার কায়েম করছে। আজ পর্যন্ত ৭০০০ জন রোহিঙ্গা জম্মুতে ঘাঁটি গেড়েছে।

একদিন কাশ্মীর থেকে অত্যাচারিত, বিতাড়িত হিন্দু পণ্ডিত আর অন্য দিক থেকে সুদূর মায়ানমার থেকে আনা রোহিঙ্গা মুসলমানের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করা কখনোই স্বাস্থ্যকর নয়। যুদ্ধের

আগে তোলা ভিডিওতে বলেছিল, 'এই ভিডিও যখন তোমরা দেখবে তখন আমি জন্নাতে থাকব।' বিধর্মী কাফেরদের মারতে পারলেই আমার স্বর্গবাস হবে, স্বর্গে আমাকে ৭২ জন অপূর্ব সুন্দরী কুমারী দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে— এটা একটা বিশ্বাস। ১৯ বছরের আদিল এই বিশ্বাস, এই সংস্কৃতির ধারক। এই সংস্কৃতির জন্যই সে আত্মঘাতী হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো কাশ্মীর মানেই কি এই সংস্কৃতি? স্পষ্ট উত্তর হলো, না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপেড়কে ইউরোপের ঐতিহাসিকরা ভারতের আলেকজান্ডার বলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে কাশ্মীরের কোরকোটা সাম্রাজ্য ললিতাদিত্যের হাত ধরে আজিকিস্তান, বুখারা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রাজতরঙ্গিনী। ১৩-শো শতকে লিখেছিলেন কলহন, কাশ্মীরের অসামান্য প্রতিভাধর কবি।

১০ম শতকে কাশ্মীরে জন্মেছিলেন অভিনব গুপ্ত। একাধারে দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষক এবং শিল্পী। সংস্কৃত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে অভিনব গুপ্তের অবদান অপরিসীম। তাই সাংস্কৃতিক ভাবে আদিলদের যেটুকু বোঝানো হচ্ছে সেটাই কাশ্মীর নয়। আর কেবলমাত্র মেরে কেটে, ধর্ষণ করে তো আর ইতিহাস মুছে দেওয়া যায় না। তাই কাশ্মীরের পাঠক্রমে (যেটা কালকের আদিল আহমদরা পড়ে বড়ো হবে) অবশ্যই ললিতাদিত্য অভিনব গুপ্ত বা কলহন থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জম্মু কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টির শিক্ষা সচেতন মানুষের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে যেসব বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসেছেন, তাদেরই একটি দল কাশ্মীরে গিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ



কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিকের সঙ্গে অরুন্ধতী রায়।

বিরুদ্ধে কলকাতায় মিটিং মিছিল করছেন যেসব মানবাধিকার সংস্থা তারা কাশ্মীরে হুরিয়ত নেতাদের বৈঠক আয়োজন করে এই বিষয় বোঝাতে পারেন।

কাশ্মীরে যে ১৫ শতাংশ ভূমিখণ্ডে কেবল পাথর ছোঁড়া, কেবল ভারত বিরোধিতা এটা কবে থেকে এত প্রবল হলো। এই উপত্যকা হিন্দুশূন্যই বা কীভাবে হলো। শ্রীনগরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে শঙ্করাচার্য মন্দির। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলেন তখন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ক্ষীরভবানী মন্দিরের অপবিত্র করার ঘটনায় একান্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক শতাব্দী ধরে হিন্দুদের কাশ্মীর থেকে তাড়ানোর চেষ্টা হলেও ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত তা সফল হয়নি। কিন্তু মৌলবাদীরা ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাস থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকা ছেড়ে যেতে বলে। মসজিদ থেকে মাইক লাগিয়ে বলা হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে থাকা পণ্ডিতরা যেন ঘর ছেড়ে চলে যায়। কাশ্মীর তৈরি হবে পণ্ডিত পুরুষদের তাড়িয়ে কেবল পণ্ডিতানী মহিলাদের নিয়ে। সমাজকর্মী টিকালাল টাপ্পু এর প্রতিবাদ করলেন। তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হলো। কর্ননসরে বিচারপতি নীলকণ্ঠ সঞ্জুকে সকালবেলা হত্যা করা হলো। তখন ফারুক আবদুল্লার সরকার সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। নীলকণ্ঠের দেহ প্রকাশ্য রাজপথে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ে ছিল। গাজীকুবার শিক্ষিকা সিরিরাজ টিপ্পুকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণ করা হলো। ৪ জানুয়ারি ১৯৯০ আবতাব পত্রিকায় হিজবুল মুজাহিদিন বিজ্ঞাপন দিয়ে শাসানি দিল। ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি দাঙ্গা এত বীভৎস রূপ নেয় যে, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু পণ্ডিতরা প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির মা-বোনদের সম্মান বাঁচাতে কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। হিজবুল মুজাহিদ্দিন সহ সবকটি মৌলবাদী শক্তির লাগাতার অত্যাচারে নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হয়ে আছেন লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত। এ বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই শুরু করা দরকার। কলকাতায় প্রতিবছরই কোনো না কোনো অতিবিপ্লবী গোষ্ঠী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদ্দিনের কোনো নেতাকে এনে অনুষ্ঠান করে। এই আয়োজকদের সঙ্গে হিজবুল নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতরা যাতে সুরক্ষিত ভাবে ফিরে যেতে পারে তার জন্য এইসব গোষ্ঠী সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

২০১০ সালে কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর এক ভয়ানক সংবাদ দিয়েছিলেন, কাশ্মীরের জেহাদিদের জন্য আফগানিস্তানের তালিবানদের কাছ থেকে 'রিমোট কন্ট্রোলড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস' আনার কাজ করেছিল মাওবাদীরা। এর আগে ভারতবর্ষে এমন ভয়ানক অস্ত্র প্রযুক্তি জেহাদিদের কাছে ছিলই না। আজ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের যুবকদের কাছে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান করা হচ্ছে। আরবান নক্সালদের সামনে আজ এক পাপস্খলন করার বড়ো সুযোগ এসেছে। আগামী দিনের আদিল মহম্মদ দাররা লেখপড়া শিখে ডাক্তার হবে, প্রযুক্তিবিদ হবে, দেশের প্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে একজন কাশ্মীরি। যাদের সঙ্গে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সামান্য হলেও সম্পর্ক তাদের এই সময় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে।

যে বন্ধুত্ব জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইন্সাল্লা, ইন্সাল্লা' স্লোগান দিয়েছিল, আলোচনা শুরু হলে হয়তো তা বদলে 'ইয়ে বর্তন মেরে আবাদ রহে তু/ জিন্দেগি ক্ষমা কি সুরত খুদা হে মেরি' ধ্বনিতে ধ্বনিতে মুখরিত হতে পারে।

অবশ্যই আলোচনা শুরু হতে পারে সংবিধানের ৩৭০ ধারা নিয়ে। ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের কোনো দিক থেকেই কোনো তফাৎ ছিল না। তাই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হায়দরাবাদের মতো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে শেখ আব্দুল্লাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সেনা তোমার সীমান্ত পাহারা দেবে আর ভারতবাসী কাশ্মীরে জমি কিনে বসবাস করতে পারবে না? এ হতেই পারে না।' তবু বাবাসাহেবকে এক প্রকার ধোঁকা দিয়েই সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত হলো। নেহরুর এই অদূরদর্শিতাকে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক দেশে একজন প্রধান, একটিই বিধান (আইন) আর একটিই নিশান (পতাকা) করার দাবিতে তিনি পারমিট না নিয়েই কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। শেখ আবদুল্লার প্রশাসন তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রকারান্তরে হত্যা করে। চিরকালের জন্য সমস্যা হয়ে থাকল কাশ্মীর। যে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক মেজর গগৈয়ের সঙ্গে ইংরেজ জেনারেল ডায়ারের তুলনা করেছেন, তিনি তো এ বিষয়টা অনেকের থেকে ভালো জানেন। আলোচনা শুরু করার জন্য তার থেকে যোগ্য ব্যক্তি আর কে হতে পারেন? অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে আজ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করা প্রয়োজন।

গোলা বন্দুক, আর ডি এক্স সত্যিই সমাধান আনার পথে অন্তরায়। যুক্তি আর মানবতার কথা ভাবলে উপরে বর্ণিত সরকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষকে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করা উচিত। কিন্তু প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায় অবশ্য অন্য কথা বলেন। তাঁর মতে কাশ্মীর ভারতে নয়, পাকিস্তানে যাওয়া উচিত। ১৬ অক্টোবর কাশ্মীরের ভারতভুক্তির দিন। গত বছর পাক সরকার সরকারি ভাবে বিশ্বের দরবারে অরুন্ধতীর বক্তব্য পরিবেশন করেছে। সেক্ষেত্রে কাশ্মীরের হাজার বছরের ইতিহাস সংস্কৃতিকে ঝিলামের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, কাশ্মীরের পণ্ডিত, জম্মুর ডোগরা আর লাদাখের বৌদ্ধদের জবাইয়ের বকরা বানিয়েও বিনাযুদ্ধে আলোচনা হতে পারে। সেই আলোচনায় পাকিস্তানের আই এস আই, কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদ্দিন, জইস-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা আর মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কেবল অরুন্ধতী রায় থাকলেই চলবে।



পরম্পরা

মুক্তির উৎসব শিবরাত্রি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অকস্মাৎ নেমে এল অন্ধকার। ঘন কালো আঁধারে ছেয়ে গেল জগৎ সংসার। স্তব্ধ চারিদিক। জীবকুলে উঠল হাহাকার। দম বন্ধ পরিবেশে বাঁচার আকুলতা।

অবস্থা দেখে বিচলিত দেবতারা। এতক্ষণ তাঁরা উপভোগ করছিলেন শিব-পার্বতীর দাম্পত্য-কলহ। কিন্তু তার পরিণাম যে এমন হবে তা তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি। সব দেখে তাঁরা তাই ভীত।

সেদিন শিব পার্বতীর মধ্যে চলছিল প্রেম-কলহ। নানা খুনসুটি। তারই মধ্যে হঠাৎই পার্বতী বলে বসেন, সে তুমি যাই বলো, শক্তি বা প্রকৃতি আছে বলেই তুমি সব কিছু করতে পারছ। শক্তির সহযোগিতা ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। তাই তুমি সর্বকর্মা এমন ভেব না!

প্রথম দিকে শিব এসব কথায় তেমন আমল দেননি। কিন্তু ক্রমেই পার্বতীর কথায় বাড়তে থাকে তাঁর অহংকারের ভাব। সেটা ভালো লাগল না শিবের। তাই পার্বতীকে শিক্ষা দিতেই একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, এতো তোমার গর্ব। এত অহংকার শক্তি নিয়ে! এই আমি ত্যাগ করলাম সব কাজ। দেখি তুমি একা কী করতে পার?

কর্মত্যাগ করলেন মহাদেব। তাতেই চরাচর জুড়ে এমন তমসা। ব্যাপারটা এদিকে গড়াবে তা বুঝতে পারেননি পার্বতীও। তাই রীতিমতো ভয় পান তিনিও। শিব এভাবে কর্মত্যাগ করলে যে অচল হয়ে যাবে সব কিছু, কারো তো কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। নেমে আসবে বিপর্যয়।

ধ্বংস হবে সৃষ্টি।

ভীত পার্বতী তাই শিবের মান ভাঙাতে শুরু করলেন সাধনা। বারবার ক্ষমা চাইতে থাকেন তিনি। দেবতারা পরমনিষ্ঠায় পুজো করতে থাকেন মহেশ্বরের।

শিব তো আশুতোষ। অল্পেই রাগ গলে জল। তাই আবার কর্মময়। পার্বতীর দিকে হেসে বলেন, দেখলে তো, একা শক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। পুরুষ আছে তাই শক্তির দাপট। তাই এমন অহংকার আর করো না কোনোদিন।

মিলমিশ হয়ে গেল পুরুষ-প্রকৃতির— শিব-পার্বতীর। জগৎ চলতে থাকে আপন ছন্দে। কোনো কোনো পুরাণে বলা হয় এটাই শিবরাত্রির উৎস।

শিব পুরাণে আছে ভিন্ন কাহিনি। এখানেও অবশ্য একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে অহংকারের। তারই জন্য শেষপর্যন্ত পঞ্চমুখ ব্রহ্মা হলেন চতুর্মুখ। হলেন শিবের ক্রোধের কারণে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রে বিষ্ণু শুয়ে আছেন অনন্ত শয়ানে। এমন সময় সেখানে হাজির ব্রহ্মা। কী মতিভ্রম হলো তাঁর, তিনি কিছুটা রেগেই বিষ্ণুকে বললেন, কেমন বে-সহবত তুমি। আমি সৃষ্টিকর্তা, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে। আর তা দেখেও এভাবে শুয়ে আছ? উঠে স্বাগত জানাচ্ছ না আমাকে? বরণ করছ না পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে?



ব্রহ্মার এসব কথাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না বিষ্ণু। মজার গলায় বলেন, তুমি বোধ হয় তোমার জন্মের কথাটা ভুলে গেছ?

কী বলতে চাইছো তুমি?

তোমার জন্ম হয়েছে আমারই নাভিকমল থেকে। সেদিক থেকে তুমি আমার পুত্র। তা আজকাল কি ছেলেকে সম্মান দেখাতে হবে বাবাকে? এ তোমার কেমন আবদার।

ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমি সৃষ্টিকর্তা। সব কিছু সৃষ্টি করি আমি। তাই আমিই শ্রেষ্ঠ। যেখান থেকেই আমার জন্ম হোক না কেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। আমিই বড়ো।

এবার কিন্তু বিষ্ণুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। তিনিও সমান জোরের সঙ্গে বলেন, ওসব অবান্তর কথা ছাড়ো। আমার থেকে তোমার জন্ম তাই আমিই বড়ো। আমিই শ্রেষ্ঠ।

কথায় কথায় দুজনেই হিতাহিত জ্ঞান হারান। এক সময় কথা ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেন তাঁরা। সেই অস্ত্রই পরস্পরের দিকে ছুঁড়তে থাকেন তাঁরা।

অস্ত্র চালানোয় দুজনেই সমান দক্ষ। তাই পরাজিত হন না কেউই। যুদ্ধ চলতেই থাকে। একসময় বিষ্ণু হাতে তুলে নেন চরম অস্ত্র মহেশ্বরাস্ত্র। তা দেখে ব্রহ্মাও হাতে নেন পাশুপত অস্ত্র।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই যুদ্ধ দেখে বিচলিত হন দেবতারা। ওই মারাত্মক অস্ত্র যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু নিক্ষেপ করেন, তাহলে শুধু যে তাঁরা বিধ্বস্ত হবেন তা নয়, সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে বিশ্বজগৎও। এই আশঙ্কা থেকেই দেবতারা যান স্বয়ং শিব মহেশ্বরের কাছে। জানান ব্রহ্মা-বিষ্ণুর এই আত্মঘাতী যুদ্ধের কথা। সকলে মিলে প্রার্থনা জানান মহেশ্বরের কাছে, যে কোনো ভাবে নিরস্ত করুন দুজনকে। রক্ষা করুন এই ত্রিভুবনকে।

মহেশ্বর অভয় দেন দেবতাদের। তারপর অগ্রসর হন সেই রণস্থলের দিকে। ওদিকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু কিন্তু নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে নিক্ষেপ করেছেন সেই ভয়ংকর মারণাস্ত্র। চারিদিকে আগুন ছড়াতে ছড়াতে সেই অস্ত্র ধেয়ে চলে দুজনের দিকে। দুই অস্ত্র যখন প্রায় মুখোমুখি, সেই সময় মহেশ্বর ওই দুইয়ের মাঝখানে উত্থিত হন অনল স্তম্ভরূপে। আর সহস্র সহস্র সূর্যের মতো প্রদীপ্ত, সহস্র ব্রহ্মনাদের মতো নিনাদিত সেই দুই অস্ত্র এসে পড়ে সেই অনল স্তম্ভে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত অস্ত্র। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে মহেশ্বরাস্ত্র এবং পাশুপত অস্ত্র বিলীন হয়ে যায় সেই অনল-স্তম্ভে।

এমন চমৎকার দৃশ্য অবাক করে সকলকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দেবতারা। বেঁচে যাওয়ার আনন্দে ত্রিভুবন মুখর হয় সেই অনলস্তম্ভের বন্দনায়। বিস্মিত হন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। সকলেরই প্রশ্ন, কোথা থেকে এল এই অনল-স্তম্ভ? কোথায় এর শুরু আর শেষই বা কোথায়?

হতবাক ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিরোধ ভুলে সেই স্তম্ভের আদি-অন্ত খুঁজে বের করার জন্য সক্রিয় হন। দুজনে পরামর্শ করেই ঠিক করলেন নিজেদের পথ। বিষ্ণু বরাহরূপে ওই স্তম্ভের উৎস খোঁজার জন্য পাতালে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে হংসবাহন ব্রহ্মা উঠতে থাকেন ওপরের দিকে— স্তম্ভের শেষ দেখার জন্য।

বরাহরূপী বিষ্ণু পাতালের বহু গভীরতর অংশে গিয়েও সেই অগ্নিস্তম্ভের মূল বা আদি দেখতে পেলেন না। পরিশ্রান্ত বিষ্ণু হতাশায় ম্লানমুখে আবার উঠে এলেন সেই সমরস্থানে।

ওদিকে ব্রহ্মাও আকাশ পথে বহু উঁচুতে উঠেও সেই অনল-স্তম্ভের মাথা দেখতে পেলেন না। ব্রহ্মা-বিষ্ণুর এই অধ্যাবসায় দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে ওঠেন মহেশ্বর। আর তাতেই তাঁর মাথা থেকে খসে পড়ে একটি কেতকী ফুল। ব্রহ্মা আকাশ পথে সেই কেতকীকে দেখে জিজ্ঞেস করেন তুমি কোথা থেকে কীভাবে এখানে এলে? কেতকী বলে, আমি এই স্তম্ভের মাথা থেকে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে এই ভাবে নামছি কিন্তু এখনও সেই স্তম্ভের অন্ত আমি দেখতে পেলাম না?

কেতকীকে দেখে ব্রহ্মার মাথায় একটা বদ খেয়াল চাপে। তিনি বলেন, তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই?

কী উপকার?

এখুনি আমরা বিষ্ণুর মুখোমুখি হব। তাঁকে বলব, এই স্তম্ভের অন্ত বা মাথা আমি দেখেছি। তুমি শুধু আমার কথায় সায় দেবে।

রাজি হয় কেতকী। ব্রহ্মা তাকে নিয়েই আসেন সেই সমর স্থানে। নিরানন্দ বিষ্ণুকে দেখে ব্রহ্মা বলেন, কী, এই স্তম্ভের আদি দেখতে পেয়েছো?

হতাশায় মাথা নাড়েন বিষ্ণু। পাঁচ মুখে হাসি ছড়িয়ে ব্রহ্মা বলেন, আমি কিন্তু স্তম্ভের মাথা দেখে এলাম। এই কেতকী তার সাক্ষী।

কেতকীও বলে, হ্যাঁ সত্যিই তিনি। স্তম্ভের মাথা দেখেছেন। ব্রহ্মার এই মিথ্যাচার ধরতে পারলেন না বিষ্ণু। তাই তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে প্রণাম ও ষোড়শোপচারে পূজা করতে থাকেন।

মহেশ্বর কিন্তু ব্রহ্মার এই মিথ্যা ভাষণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন সেখানে।

তাঁকে দেখেই ব্রহ্মা থরহরি। মহেশ্বর বিষ্ণুকে বললেন, অহংকারে তুমিই প্রধান এই বোধে ব্রহ্মার সঙ্গে কলহ করলেও তুমি সত্যবাদী। তাই পৃথক মূর্তিতে তোমার মন্দির হবে, পূজাও হবে।

কিন্তু ব্রহ্মা অমৃতভাষী। তাই বিশ্বে তার পূজা বা উৎসব কিছুই হবে না। বলতে বলতেই তাঁর কপাল থেকে এক ভৈরব মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। মহেশ্বরের আদর্শে ভৈরব তখন ব্রহ্মার মিথ্যে কথা বলা পঞ্চতম মাথাটি ছিঁড়ে নেন। কাতর ব্রহ্মা কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইলে মহেশ্বর তাঁকে ক্ষমা করেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মহেশ্বর সেদিন কেতকীকেও অভিশাপ দেন। বলেন, এখন থেকে আর কেতকী ফুল দিয়ে আমার পুজো হবে না।

মহেশ্বরের এই মহত্ব এবং বিরাটত্ব দেখে অভিভূত হন ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং দেবতারা। তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করেন তাঁরা। প্রীত মহেশ্বর বলেন, তোমাদের এই পুজোয় আমি পরিতুষ্ট। তাই আজ থেকে চিরকাল এই দিনটি শিবরাত্রি হিসেবে পালিত হবে। ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশীর এই শিবরাত্রির দিনে উপবাসী থেকে রাত্রে চার প্রহরে যারা আমার পুজো করবে তারা সকলেই মুক্তি পাবে। তাদের আর যমলোকে যেতে হবে না।

পরবর্তীকালে পার্বতীকে এই দিনটির মাহাত্ম্যের কথা বলে মহেশ্বর তাঁকে শোনান সুন্দর সেন নামে এক নিষাদ রাজের কথা। মৃগয়ায় গিয়ে সারাদিন উপবাসে ক্লান্ত সুন্দর সেন রাতে না জেনেই এক শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়ে নিজের অজান্তেই চার প্রহরে পূজা, মন্দির মার্জন ইত্যাদির মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করেন। সেই পুণ্যেই তিনি শিবলোকবাসী হন।

শিবরাত্রি ভারতে একটি প্রায় সর্বজনীন পূজা-উৎসব। শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মানুষই শিবরাত্রি ব্রত পালনকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। শাস্ত্রে আছে, মহাদেবের মতো পূজনীয় দেবতা নেই। শিবরাত্রির সমান ব্রত নেই। সারা ভারতেই শিবরাত্রি ব্রত পালন করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে। শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা উৎসবও পালিত হয়। সব মিলিয়ে শিবরাত্রি হলো আপামর জনগণের অন্তরের উৎসব। ■

বাংলায় নাগরভজনের প্রবর্তক নহহরি সরকার

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম। পুরোনো নাম বৈদ্যখণ্ড। কেননা, এককালে উত্তর রাঢ়বঙ্গের বৈদ্যপ্রধান স্থান ছিল শ্রীখণ্ড। এখানকার বৈদ্যরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ছিলেন। নবাবি আমলে গৌড়ের দরবারে তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্তীকালে গ্রামের নাম বদলে যায়। গ্রামে প্রবেশের মোড়েই খণ্ডেশ্বরীতলায় খণ্ডেশ্বরী দেবীর 'থান' আছে। একখণ্ড পাথর দেবীর প্রতীক। এই দেবীর নামানুসারেই বৈদ্যখণ্ড হয়েছে শ্রীখণ্ড।

শ্রীখণ্ডের খ্যাতির অবশ্য মূল কারণ বৈষ্ণবসাধক ও পদকর্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের সাধনলীলার পটভূমি রূপে। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, নরহরি পূর্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী মধুমতী রূপে বৃন্দাবনে বিরাজ করতেন। তাঁর জন্ম ১৫ শতকের শেষ দিকে। কথিত আছে, বাল্যকালে নরহরি গৃহদেবতা গোপীনাথকে নিজের হাতে নাড়ু খাইয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন অধ্যয়ন করতে। সেখানে গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ ও মিলন হয়। তিনি গৌরাঙ্গের থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড়ো ছিলেন।



নবহরি ঠাকুর বঙ্গে নাগরভজনার (নারী বা সাধিকা রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যর উপাসনা) প্রবর্তক। একে মধুর সাধন, রাগাত্মিকা ভজনপদ্ধতিও বলে। এর মধ্যে কিছুটা তান্ত্রিক আচারও মিশে আছে। তাঁর উপাসনা পদ্ধতি, তাঁর দুই প্রধান শিষ্য লোকানন্দ ও লোচনানন্দ (চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস— এই কবিই গৌরাঙ্গর সম্পর্কে যাবতীয় কিংবদন্তি নির্মাণ করেছিলেন)-র মাধ্যমে দুই ভাগ হয়ে যায়। প্রথমটি প্রচলিত বিধিমার্গ ও দ্বিতীয়টি রাগমার্গ। দুটোতেই অবশ্য শ্রীচৈতন্য উপাসনা বা ভজনার তত্ত্বকথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, লোকানন্দর ভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে তান্ত্রিক আচার-বিচার প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত, নরহরি সরকার নিজেই ছিলেন বৌদ্ধ সহজমান ক্রিয়ার উত্তরসাধক। পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব প্রভাবে বৌদ্ধ সহজমান, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনপদ্ধতি রূপে খানিকটা পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদের জায়গায় আসে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ধ্যানকল্পনা তত্ত্ব।

নরহরির আর এক কীর্তি নিমকাঠের গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই প্রথম চৈতন্যপুজো শুরু করেছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর তিনটি নদীয়া-নাগর বিগ্রহ তৈরি করে শ্রীখণ্ড, গঙ্গানগর (পূর্ববঙ্গ) ও সবচেয়ে বড়ো মূর্তিটি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের স্মৃতিজড়িত কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। ইদানিং, কাটোয়া বাদে বাকি দুটি বিগ্রহ অধিষ্ঠিত শ্রীখণ্ডেই। অন্যদিকে, উত্তর রাঢ়বঙ্গের মনোহরশাহী কীর্তন প্রচলনেও নরহরির বিশেষ অবদান রয়েছে।

নিত্যানন্দর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন। তিনি নরহরির কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, যে পুকুরের জল তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, এখন সেই পুকুর 'মধুপুষ্করিণী' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি : সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরাঙ্গ নরহরিকে নবদ্বীপে শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে পুরী যাত্রা করেছিলেন।

নরহরির পদাবলীর মধ্যে সহজমতের (সহজধর্মানুরাগ বা নাগরীভাব) প্রভাব আছে। তাঁর 'পদে' তিনি নাগরীভাবে শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি নিবেদন করেছেন।

এমন শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের বংশ তিন শরিকের বাড়িতে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার মধ্যে উত্তরবাড়ি শাখায় মদনগোপাল, মাঝের বাড়িতে মদনমোহন ও দক্ষিণ বাড়িতে গোবিন্দজীউ ও রাধিকা বিগ্রহ আছেন। কুলদেবতা গোপীনাথের স্বতন্ত্র মন্দিরে গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার (নরহরির ভাইপো রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত) বিগ্রহ অধিষ্ঠিত।

নরহরি সরকারের মতো দেবানন্দ পণ্ডিতও একজন খ্যাতকীর্তি বৈষ্ণব সাধক। তাঁর কাহিনি অবশ্য স্বতন্ত্র।

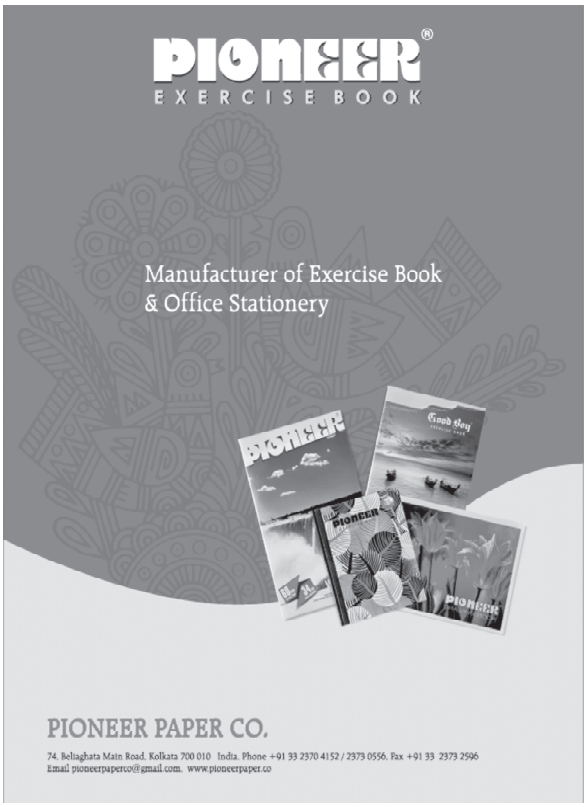
কল্যাণী স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে নদীয়া জেলার অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ ফলিয়া। সেখানে রাস্তার ধারে একটা মাঠের প্রান্তে গাছগাছালির মাঝে দক্ষিণমুখী এক মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সমতল ছাদের ওপর খাঁজকাটা দেউলশিখর স্থাপিত। সামনে নাটমন্দির। গর্ভগৃহে কাঠের গৌর-নিতাইয়ের দুটি বড়ো বিগ্রহের সঙ্গে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধা বিরাজ করছেন। এই শ্রীপাট বা দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৫৫০ বছর আগে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে জ্ঞানমার্গের এক সাধক ও অধ্যাপক। তিনি ছাত্রদের শ্রীমদ্ভাগবত পড়াতেন। পক্ষান্তরে, তপস্বী হয়েও তিনি ভক্তিহীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। একবার হয়েছিল কী, একদিন গৌরাঙ্গের পার্ষদ শ্রীবাস তাঁর কাছে ভাগবত শুনতে এসে, শ্লোক শোনামাত্র বিভোর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। শ্রীবাসের 'পাগলামি'-তে বিরক্ত হয়ে দেবানন্দ তাঁকে মারধর করে তাড়িয়ে দেন। এই অপরাধে দেবানন্দর কুষ্ঠ হয়। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তনসঙ্গী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের দয়ায় তাঁর ভক্তিরস জন্মায়। কিছুদিন পরে স্বয়ং মহাপ্রভু কুমারহট্ট যাওয়ার পথে ফলিয়ায় এলে, দেবানন্দ তাঁর পায়ে পড়েন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁর অতীতের অপরাধ ক্ষমা করে, কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দেন। পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীতে এই ঘটনা ঘটে, সেই থেকে শুরু হয় অপরাধভঞ্জনের মেলা, যা আজও চলছে। এখনও মেলার সময়ে বহু বৈষ্ণবদের সমাগম হয়। তেমনই আরেকটি মেলা বসে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

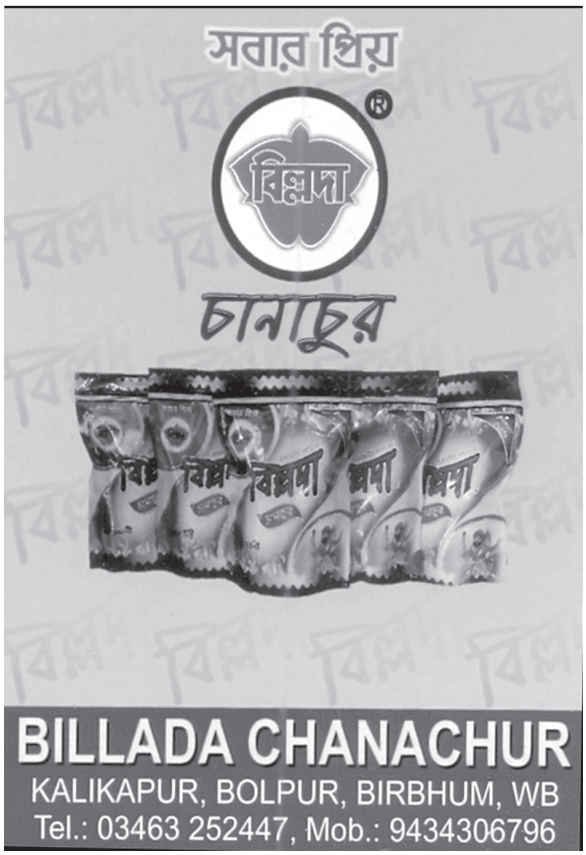
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



অস্তিত্বের সংকটে বাঙ্গালী হিন্দু

নন্দ দুলাল চৌধুরী

সূচনা ঃ বাংলাদেশি মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিম বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গেছে। তদুপরি, সম্প্রতি অসাম সরকার কর্তৃক NRC (National Register of Citizens) প্রকাশের প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার ছেড়েছেন ঃ পূর্ব পাকিস্তান ও তার বাঙ্গালি সংস্করণ বাংলাদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানের বিরুদ্ধে অসম সরকার তথা ভারত সরকার কোনো ব্যবস্থা নিলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে। পরন্তু, ওই অনুপ্রবেশকারীদের তিনি তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, সেক্ষেত্রে বাঙ্গালি হিন্দুর কী গতি হবে? আর এই civil war ও bloodbath কার বিরুদ্ধে? এখনও সতর্ক ও সক্রিয় না হলে আগামী ৫/৭ বছরেই স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালি হিন্দুর নিজের রাজ্য বলে কিছু থাকবে না, তার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। সমগ্র বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক।

গোড়ায় গলদ ঃ স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক চর্চা (Political discourse) শুরু থেকেই গোঁজামিল-দুষ্ট। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ব্যাপারটা সেখানে বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। পাকিস্তান যদি ''শুধু মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি'' হয়ে থাকে, তবে স্বাধীন ভারত অনিবার্যভাবেই হয়ে যায় ''অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বাসভূমি''। তবু আমরা মূর্খ উল্লাসে বলে গেছি, মুসলমানদের ভোট না পেলে কোনো দলের পক্ষে কেন্দ্রে সরকার গড়া সম্ভব নয়। আমরা ভেবে দেখিনি, বা দেখছি না যে, একথার মানে দাঁড়ায়, স্বাধীন ভারতের ভাগ্যকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা। এভাবে দশকের পর দশক ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে তুষ্ট ও পুষ্ট করে আমরা আবার দেশভাগের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে ফেলেছি। Course Correction বা গতিপথ সংশোধনের সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা ছিলেন জনসংখ্যার ২২% মতো; সাধের পাকিস্তানে তাদের জন্য ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ২০% ভূমি দেওয়া হয়। তাহলে স্বাধীন



> "মমতা ব্যানার্জি তাঁর মোঠো বক্তৃতার সহজিয়া মায়ায় ভুলিয়ে বাংলার হিন্দুদের আত্ম-বিলোপের পথে ঠেলে দিচ্ছেন।"

ভারতে মুসলমানদের জন্য ন্যায়ত ধর্মত আইনত এক ইঞ্চি জমিও অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুত, ভারতে তাদের অস্তিত্বের যৌক্তিক ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। যৌথ মূলধনী কারবার থেকে যদি কোনো অংশীদার তার পুঁজি তুলে নেয়, তাহলে কারবারে তার অংশীদারিত্ব সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। সে যাই হোক, স্বাধীন ভারতের মুসলমানদের কেউ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেনি, আজও বলছে না। হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ, বি.জে.পি, আর. এস. এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সকলের বিচারে মুসলমানরা ভারতীয় জাতিসত্তার অন্যতম উপাদান। এদের শুধু একটাই দাবি, বিচ্ছিন্নতাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে, অভিন্ন আইনবিধি (uniform Civil Code) স্বীকার করে ভারতের মুসলমানদের ভারতের রাষ্ট্রসত্তায় শামিল হতে হবে। রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে কোনো পৃথক 'উম্মাহ'-র আনুগত্য স্বীকার করা, কিংবা আল-কায়দা বা ISIS-এর সমর্থনে নেচে ওঠা চলবে না।

এক যাত্রায় পৃথক ফল ঃ ভারত ভাগ তথা বাংলা ভাগের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙ্গালি হিন্দু; আর সর্বাধিক লাভবান হয়েছে বাঙ্গালি মুসলমান। বাঙালি হিন্দুর বসবাসের ভূমি ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে চলেছে। ঘটনাটা এরকম ঃ

(১) ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত যত হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এসেছে, তার ২৫

ফ ঃ ৫

ভাগের এক ভাগ মুসলমানও পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে/বাংলাদেশে চলে যায়নি।

(২) পূঃ পাঃ বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো Hindu Factor নেই; হিন্দুরা সেখানে political non-entity রাজনৈতিক অসত্তা। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের সব দলই তোয়াজ করে চলে, তারাই নাকি রাজ্য-রাজনীতির নিয়ামক শক্তি।

(৩) বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুরোপুরি এক-তরফা, মুসলমানরা মারে, আর হিন্দুরা মরে। এবং তা নিয়ে কোথাও কোনো উচ্চবাচ্য হয় না। অন্যদিকে, সারা ভারতে পশ্চিম বাংলাই একমাত্র রাজ্য, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানরা আগ বাড়িয়ে দাঙ্গা বাধায়। তৃণমূল সরকারের আমলে তো এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) দেশভাগের বলি বাঙ্গালি হিন্দু যে পূঃ পাঃ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে আসবে, সেটা অনিবার্য। কিন্তু আসল বিপদটা হল, বাংলাদেশের human hatchery-তে যে অগণিত বাঙ্গালি মুসলমান প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিম বাংলায় ঢুকে পড়ছে। পূর্বেকার বামফ্রন্ট সরকার এই ভয়ঙ্কর অনুপ্রবেশের সমস্যাটি উপেক্ষা করে গেছে; আর বর্তমান তৃণমূল সরকার তো ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করার জন্য একে উৎসাহিত করছে। **পরিণামে, বাঙ্গালি হিন্দু তার শেষ আশ্রয়স্থলটুকু অর্থাৎ পশ্চিম বাংলাও হারাতে বসেছে। এখনও সতর্ক হলে নিকট ভবিষ্যতে বাঙ্গালি হিন্দুর নিজস্ব রাজ্য বলতে কিছু থাকবে, না হলে নিকট ভবিষ্যতে বাঙ্গালি হিন্দুর নিজস্ব রাজ্য বলতে কিছু থাকবে না। সে একটা endangered species বা বিপন্ন প্রজাতি বলে চিহ্নিত হবে।** পিতৃ-পুরুষের বাসভূমির দখল রাখতে না পারায় ইহুদিদের যেমন দেশে-দেশে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে বাঁচতে হয়েছে, বাঙ্গালি হিন্দুদেরও তেমনি ভারতের রাজ্যে রাজ্যে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বাঁচতে হবে। লক্ষ্য করুন, বাংলাদেশে ১৯৫১ সালে হিন্দুরা ছিলেন জনসংখ্যার ২২.০৫%, আর ২০১১-য় তারা হয়েছেন ৮.৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় ১৯৫১ সালে মুসলমানরা ছিলেন জনসংখ্যার ১৯.৮৫ শতাংশ আর ২০১১-য় তারা হয়েছেন ২৭.১ শতাংশ। আর ২/১ দশক পরে বাঙ্গালি হিন্দুর কী দশা হবে?

অসম প্রসঙ্গ ঃ স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হয়েই মুহম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা করেন, ওই 'moth-eaten' বা পোকায় খাওয়া পাকিস্তান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। আর, অসম তিনি পূর্ব পাকিস্তানিদের সোনার থালায় করে উপহার দেবেন। তখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাকিস্তান সরকার অসমের জনবিন্যাসটাই পালটে ফেলেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারও একইভাবে দেশের উদ্বৃত্ত মুসলমানদের অসমে ঠেলে দিয়েছে। এসবের পরিণতিতে ১৯৮০ সাল নাগাদ অসম গণ পরিষদ ও আসু (অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের জন্য প্রবল গণ আন্দোলন শুরু করে। ঠেলায় পড়ে রাজীব গান্ধীর সরকার ১৯৮৪–৮৫ নাগাদ অসমের জন্য বা জাতীয় নাগরিক-পঞ্জি বানানোর কথা ঘোষণা করে। অনেক টালবাহানার পর সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আজ যখন বি.জে.পি. সরকার জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর খসড়া প্রকাশ করেছে এবং প্রায় ৪০ লক্ষ বাঙালি মুসলমানের নাম বেআইনি অভিবাসী বা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তখন কতিপয় বিরোধী দল তার প্রতিবাদে সংসদে সোরগোল তুলেছে। আর এই অপকর্মের নেতৃত্বে আছেন হতভাগ্য পশ্চিম বাংলার দুর্দান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। মূল বিষয়টাই তিনি ঘেঁটে দিচ্ছেন। (i) দেশের বিশেষ করে বাংলার মানুষকে তিনি এতটাই বে-আক্কেল ভাবছেন যে, একটা ডাহা মিথ্যে তিনি অবলীলাক্রমে ব'লে চলেছেন—এন আর সি বহির্ভূত ওই ৪০ লাখ মানুষ প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান— বিহার, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য থেকেই অসমে ঢুকেছে। সত্যিটা হল ঃ এরা সকলেই বাংলাদেশি মুসলমান, কারণ এরা বাংলায় কথা বলে।

(ii) বেপরোয়া মুখ্যমন্ত্রী ওই ৪০ লাখ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে পশ্চিম বাংলায় চলে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এখন বাংলার মানুষদের, বিশেষত বাংলার হিন্দুদের, ভেবে দেখতে হবে এই বাংলার ভূ-খন্ডের মালিক তারা, নাকি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়? বাংলার মাটির বিলিবন্টনের জন্য তারা কি মমতা ব্যানার্জিকে power of attorney দিয়ে রেখেছেন?

অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গ ঃ এবারে একটি মৌলিক প্রশ্নে আসা যাক। বনচারী মানুষ যেদিন লোকালয়ের পত্তন করেছে, সেদিন থেকেই মনুষ্য সমাজে একটি অমোঘ নিয়ম কার্যকর হয়েছে : ''the perpetual struggle for room and food'', অর্থাৎ বাসভূমি ও খাদ্যের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম। সে কারণেই পৃথিবীর কোনো দেশ বা রাষ্ট্র বহিরাগত অভিবাসীদের প্রতি 'খোলা-দরজা নীতি' অবলম্বন করতে পারে না। আমেরিকার মতো সম্পদশালী দেশকেও সেটা ঠেকে শিখতে হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার মতো জনবহুল রাজ্যের পক্ষে তো সেটা আত্মহত্যারই নামান্তর। তাছাড়া, দেশভাগ ও জিন্নাহর অসম দখলের কৌশলের প্রেক্ষিতে অসমে অনুপ্রবেশকারী বাঙালি মুসলমানরা স্পষ্টতই ভারতের সংহতি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। এখন প্রশ্ন হলো এতগুলি মানুষ কোথায় যাবে? এদের নিয়ে কী করা হবে? বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো অসম্ভব—যদিও সেটাই ন্যায়সঙ্গত। আবার এদের বৈধ নাগরিকত্ব দিলে অনুপ্রবেশকেই পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা হবে। কাজেই, এদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক, এদের 'অবৈধ বাসিন্দা' বলে চিহ্নিত করে রাখাটা জরুরি।

অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থী ঃ যেসব স্বঘোষিত উদারনৈতিক মানবতাবাদী ব্যক্তি, সংগঠন বা রাজনৈতিক দল যেমন—কংগ্রেস, সি. পি. এম., তৃণমূল কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীর মধ্যে প্রভেদ করতে নারাজ তারা আসলে দেশের শত্রু, আরও বেশি করে হিন্দুর শত্রু। বাংলাদেশের দৃষ্টান্তটি বিচার করুন ঃ (i)

সেখান থেকে হিন্দুরা আসে ধর্মীয় কারণে, নির্যাতন ও লুণ্ঠন থেকে বাঁচতে, একটু নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার জন্য। অনন্ত কাল ধরে তাদের আশ্রয় দান ভারতের ঐতিহাসিক দায়। UNHCR-এর সংজ্ঞানুসারেই তারা শরণার্থী। (ii) পক্ষান্তরে, মুসলমানরা ভারতে ঢোকে জেহাদি জোশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কাজেই তারা সর্বার্থে অনুপ্রবেশকারী ও বিতাড়নযোগ্য। অর্থনৈতিক বা মানবিক কারণের দোহাই দিয়ে যারা এই অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে ওকালতি করেন, তারা আবার ভারত ভাগের পথই প্রশস্ত করেন।

খাল কেটে কুমির আনা ঃ বামফ্রন্টের দীর্ঘ ৩৪ বছরের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ যেদিন মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তারা খাল কেটে কুমির আনছে। ক্ষমতায় এসেই মমতাজি মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে নির্লজ্জভাবে মুসলমান তোষণ শুরু করলেন। নমুনাগুলি দেখুন—

(i) মসজিদের ইমামদের জন্য তিনি ''ইমাম ভাতা'' ঘোষণা করলেন।

(ii) প্রথমদিকে হিন্দুদের বাদ দিয়ে তিনি শুধু মুসলমান ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন।

(iii) জেলায় জেলায় তিনি 'সংখ্যালঘু ভবন' নির্মাণ করলেন।

(iv) সংবিধানের নিষেধ অমান্য ক'রে এবং মন্ডল কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করে মমতা ব্যানার্জি গায়ের জোরে পশ্চিম বাংলার প্রায় সব মুসলমানকে রাতারাতি ওবিসি বানিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য সরকারি চাকুরি সংরক্ষণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দিলেন। ফলে, মণ্ডল কমিশন মধ্যবর্ণের যে হিন্দুদের (জনসংখ্যার প্রায় 52%) ওবিসি বলে চিহ্নিত করেছে, তাদের দেবার মতো আর কিছুই রাজ্য সরকারের হাতে রইল না। এভাবে মমতা ব্যানার্জি এদের স্থায়ী সর্বনাশ করলেন।

(v) বর্ধমানের খাগড়াগড়ে তৃণমূলের এক মুসলিম নেতার বাড়িতে বহিরাগত জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের বোমা তৈরির কারখানার খবর যখন আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে ফাঁস হয়ে গেল, তখন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল আসার আগেই মমতা ব্যানার্জি রাজ্য পুলিশের দল পাঠিয়ে তড়িঘড়ি করে প্রাপ্ত বোমাগুলি ফাটিয়ে ফেললেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি দাবি করলেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-ই ষড়যন্ত্র করে বোমাগুলি ওখানে রেখে দিয়েছিল। এই ভয়ঙ্কর অভিযোগে স্তম্ভিত হয়ে 'আনন্দবাজার' এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল, ইহাকে যদি দেশদ্রোহিতা না বলা হয়, তবে দেশদ্রোহিতা কী?

সুধী পাঠক, অবহিত হোন, এভাবে চলতে থাকলে বাঙ্গালি হিন্দুর ভিটেছাড়া অর্থাৎ বাংলাছাড়া হবার আর দেরি নাই। মমতা আসলে কাদের 'অ্যাজেন্ডা' বাস্তবায়ন করছেন?

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বর্গ ঃ বি.জে.পি.-র কোনো অবাঙ্গালি কেন্দ্রীয় নেতা এরাজ্যে সভা করতে এলেই মমতা হুঙ্কার ছাড়েন—আগুন নিয়ে খেলবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান এই বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা ছড়াবেন না। তা, এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শনটিও এই সোনার বাংলাতেই রয়েছে ঃ 1946 সালের 16 আগস্টের The great Calcutta Killing। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির পরিকল্পনায় সংঘটিত এই দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দুর প্রাণ গিয়েছিল। বাংলার অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের কল্পকাহিনী আর কত শুনব?

বাঙ্গালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের কীর্তি ঃ এই মহান বাংলার পেশাদার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা দু'টি বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান—ভণ্ডামি ও কাপুরুষতা। প্রমাণ দেখুন—

(i) 1990-এর দশকের শুরুতেই যখন কাশ্মীরি মুসলমানরা সেখানকার হিন্দু পণ্ডিতদের (সংখ্যায় প্রায় তিন লাখ)—মেরে-কেটে তাড়িয়ে দেয়, তখন বা অদ্যাবধি তার প্রতিবাদে কোনো বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী 'টু' শব্দটি করেননি।

(ii) বামফ্রন্ট সরকার যখন সুকৌশলে মুসলমান মৌলবাদীদের উস্কানি দিয়ে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামায়, তখন তসলিমার পক্ষে মিটিং-মিছিল করা দূরে থাক, আমাদের বীর বুদ্ধিজীবীরা কেউ মুখই খোলেননি।

(iii) বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হিন্দু নির্যাতন ও নিধনে এদের সুখনিদ্রার কখনও কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি।

পরিত্রাণের পথ ঃ ২০১১ সালে আমরা বামফ্রন্টের ফুটন্ত কড়াই থেকে বাঁচার আশায় তৃণমূলের জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। তারপর—সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএসের মতো চিটফাণ্ডের টাকা কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে, সেটা জেনেও ২০১৬ সালে আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছি। চোখের সামনে দেখছি, সিপিএমের ''ক্যাডার''দের তুলনায় তৃণমূলের ''দিদির ভাই''রা কতো বেশি অত্যাচারী ও ভয়ঙ্কর। ব্যাপক রিগিং হওয়া সত্যেও সিপিএমের আমলে অন্তত নির্বাচনটা হত। আর, তৃণমূল জমানায় বিরোধী দলের প্রার্থীর নির্বাচনে দাঁড়ানোটাই অপরাধ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে 34% আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছেন। এটা জবরদস্তির জাতীয় রেকর্ড। সম্ভবত বিশ্বরেকর্ড। তৃণমূলী উন্নয়নের করাল মূর্তি দেখে শঙ্খ ঘোষের মতো স্থিতধী, মিতবাক মানুষের কবিতায়ও তীব্র ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে : ''দ্যাখ মেলে তোর তিন নয়ন/রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে/খড়্গ হাতে উন্নয়ন।''

বাঙ্গালি হিন্দুর হাতে কিন্তু আর সময় নেই। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা তার মোহন সুরের জাদুতে ভুলিয়ে ওই শহরের শিশুদের সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মেরেছিল। তেমনি, মমতা ব্যানার্জিও তাঁর মোঠো বক্তৃতার সহজিয়া মায়ায় ভুলিয়ে বাংলার হিন্দুদের আত্ম-বিলোপের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। বাঁচার একমাত্র পথ হলো, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে যথাসম্ভব খর্ব করা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই বিষাক্ত তৃণকে সমূলে উপড়ে ফেলা। এবারের শ্লোগান হোক ঃ মমতা হটাও—বাংলা বাঁচাও।" অন্যথায় বাঙ্গালি হিন্দুর নিস্তার নেই, ''অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" ■

সীমাপার পাকিস্তান পরে, আগে ঘরের পাকিস্তানের বিনাশ চাই

প্রীতীশ তালুকদার

বক্তব্য সংশোধন করুন মোদীজী, একশো ত্রিশ কোটি ভারতীয় ক্ষুব্ধ নয় একেবারেই। তাকিয়ে দেখুন, চল্লিশ সেনার মৃত্যু ঘটানো জঙ্গি আদিল আহমেদের জানাজায় ভিড় জমেছে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে খুশির হাওয়া। ভারতের পেটের ভিতর থেকেই ভেসে ভেসে আসছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান। দেশভক্তদের শোক মিছিলে হামলা চলছে। ফেসবুকের মতো গণমাধ্যমেও দেখতে পাবেন সে উল্লাস। তাকিয়ে দেখুন মন্ত্রী সিধু কি বলছে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা ব্যানার্জী, সীতারামরা কী বলছে। ভারতের পেটের ভিতর অনেক পাকিস্তান গুটি বেঁধেছে সেই কবেই, জল হাওয়া পেয়ে বেশ তরতরিয়ে উঠেছে। ক্ষুব্ধের সংখ্যাটা অনেকটাই কমবে মোদীজী। আমরা যন্ত্রণাকাতর, ক্ষুব্ধ। তা না হয়ে কি করে থাকি? আমরা যে শুধু ভারতবাসী নয়, ভারতীয়, ভারত মায়ের সন্তান। ভয়ানক বিস্ফোরণে সেনা ভর্তি গাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সঙ্গে বাইরে ওৎ পেতে থাকা জঙ্গিরা শুরু করল বুলেট বৃষ্টি। বিস্ফোরণের ধোঁয়া কাটতেই বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠল। রাস্তার বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়ানো সিআরপিএফ জওয়ানদের টুকরো টুকরো শরীর। যুদ্ধের ময়দানে নয়, চল্লিশ জন জওয়ানের নির্মম মৃত্যু ঘটল নিশ্চিন্ত পথে। আহত জওয়ানের সংখ্যাও পঞ্চাশের বেশি। এমন ভয়াবহ নাশকতা কে বা কারা ঘটালো, কেন ঘটালো সে প্রশ্ন সরকারি স্তরে তদন্তের বিষয় হলেও বাস্তবের নিরিখে নয়। কয়েক দশক ধরে এমন নাশকতা ঘটছেই। পিছনে যে সরাসরি আছে পাকিস্তানের নানা ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের অনুপ্রাণিত ও পুষ্ট এদেশীয় জঙ্গিরা তা সবাই জানে। এদিনের নাশকতা ঘটিয়েছে শ্রীনগরের বাসিন্দা জঙ্গি আদিল আহমেদ। সঙ্গী ছিল আরও যারা বাইরে থেকে ঘিরে ধরে গুলিবর্ষণ করে গা ঢাকা দিয়েছে। পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদ বুক ঠুকে আক্রমণের দায় স্বীকার করে নিয়েছে যার প্রধান মাসুদ আজাহার। আপনিও ক্ষুব্ধ, কিন্তু কী করবেন? প্রত্যাঘাত? সেটা খুব জরুরি।

পাল্টা সমুচিত আঘাতই ক্ষতের প্রলেপ, পাকিস্তানের জঙ্গিপনা রোখার জন্য পাল্টা আঘাতে ভয় ধরানো এবং স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা পুনরুদ্ধার দরকার। কিন্তু তার পর? আমেরিকা পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে লাদেনকে মেরেছে। উড়ি সন্ত্রাসি হামলার পর আমাদের সেনা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে পাকিস্তানে ঢুকে ওদের খতম করে এসেছে কিছু আগেই। তবুও পাকিস্তানের ভারত নীতি, জঙ্গিবাদ, কাশ্মীর নীতি একই আছে তা ওরা বার বার প্রমাণ করছে। চল্লিশের পাল্টা চারশো মারতে হবে। আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে হবে। তাতেও পাকিস্তান সংযত হবে না তার কারণ, রাষ্ট্রীয় বিকাশ ও শান্তি ওদের লক্ষ্য নয়, ওদের লক্ষ্য ধর্ম বিদ্বেষ প্রসূত হিন্দু ভারতের বিনাশ, তার জন্য জিহাদ।





একসঙ্গে পাকিস্তানীপ্রেমী গ্যাং প্রকাশরাজ, জিগনেস ভিমানি, ওমর খালিদ, কানহাইয়া কুমার (উপরে)

চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত হয়েও ইজরায়েল যা পারে বিশাল ভারত তা পারে না কেন? ইতিহাস সাক্ষী, গৃহশত্রু বড়ো শত্রু। যখন এতগুলো সৈনিকের নির্মম মৃত্যুতে দেশ যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সৈনিক বেশে প্রাণবন্ত যুবকেরা কফিন বন্দি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্ত-মাংসের পিণ্ড হয়ে সন্তান হারা মা-বাবার ঘরে ফিরছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দিকে দিকে ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে ঠিক তখন এই দেশেই আওয়াজ উঠছে 'তদন্ত না করে পাকিস্তানকে দোষ দেওয়া উচিত নয়', 'যুদ্ধ সমাধান নয়', 'পাকিস্তান দায়ী নয়'। এরা কী নিজ দেশের উপর আঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট নয়? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আজও এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে চায় না কেন? এরা, হুরিয়ত নেতারা,





নিরাপত্তারক্ষীদের উপর পাথর ছুঁড়ছে পাকপ্রেমী কাশ্মীরি যুবকরা।

পাকিস্তানবাদি মেহবুবা, ফারুক আব্দুল্লা, পাথরবাজদের সমর্থক রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীরা, এরা আজও সক্রিয় পাকিস্তান আর তাদের জঙ্গিদের সহায়তায়। দেশের ভিতর দেশোদ্রোহী না থাকলে কয়েক জন বন্দুকধারি জঙ্গি কখনই নাশকতা চালাতে পারে না। এরাই ওদের সহযোগী টিম। ঘরের শত্রু নির্বিচারে দমন না করলে কোনো যুদ্ধ কোনো প্রচেষ্টাই পাকিস্তান ও ইসলামিক সন্ত্রাসি আক্রমণ থেকে ভারতকে বাঁচাতে পারবে না।

উপত্যকায় যারা সেনার উপর হামলে পড়ে পাথরে পাথরে ক্ষত-বিক্ষত করে তারা শুধুই পাথরবাজ নয়, তারা পাকিস্তান ও তাদের জঙ্গিদের হয়ে চরবৃত্তি করে, দেশের ভিতরের সকল সন্ধান সরবরাহ করে। তারা ওই জঙ্গিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, আশ্রয় দেয়, খাবার ওষুধ অস্ত্রের জোগান দেয়। তারপর সেই জঙ্গিরা কখনো সেনার সামনে বিপন্ন হয়ে পাথর হাতে সেনাকে আক্রমণ করে। ওই পাথরবাজরা কোন হিসাবে জঙ্গি নয়? দেশের যে সকল রাজনৈতিক দল ও নেতা, সমাজকর্মী, কলাকুশলিরা ওই পাথরবাজদের সমর্থনে পথে নামে, দেশের সেনার উপর চাপ সৃষ্টি করে ও সেনার হাত-পা বাঁধতে চায় তারাও ওই জঙ্গিদের থেকে আলাদা নয়। এরা সকলে মিলে একটা টিম, একটা শত্রুদল।

বাক্‌স্বাধীনতার নামে যারা দিল্লির বুকে জঙ্গি আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিশোধে মুষ্ঠি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার প্রতিজ্ঞা করছিল তাদের সঙ্গে পাকিস্তান ও পাকিস্তানি জঙ্গিদের কোনো পার্থক্য নেই। এরা সকলেই ভারতের বরবাদি চায়, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। ভারতের ভিতরে ওই পাকিস্তানি জঙ্গি আর ওই পাথরবাজদের শক্তির উৎস কী এই টুকরো গ্যাঙ নয়! ওই টুকরো গ্যাঙের সমর্থনে তাদের রক্ষাকবজ হয়ে ছুটে গিয়েছিল রাহুল গান্ধী,প্রকাশ কারাত, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা। এক শ্রেণীর টিভির পর্দায় এসে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে সরকারকেই আক্রমণে নেমেছিল। সমস্ত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হবার পরও অরবিন্দ কেজরিওয়াল ওদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার অনুমতি আটকে রেখে ভারতকে যারা টুকরো করতে চায় তাদের রক্ষাই তো করছে, আর ভারতের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করছে।

জম্মু-কাশ্মীরের হুরিয়ত নেতারা দেশের কোন সেবায় লাগে যে তারা দেশের নিরাপত্তা, গাড়ি, বাংলো, ভাতায় পুষ্ট হবে? ওরা প্রকাশ্যেই দেশ বিরোধী। জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তান ও সকল সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের প্রধান অবলম্বন, আশ্রয়দাতা, জোগানদাতা, রক্ষক, সহায়ক। ভারতে থেকে, ভারতের খেয়ে, ভারতের নিরাপত্তা ও সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওরা স্লোগান তোলে 'পাকিস্তান হামারা হ্যায়, হাম পাকিস্তানি হ্যায়'। সরকারি সুযোগ-সুবিধা তো অনেক পরের কথা, কেন ওরা জেলে না পচে মুক্ত সমাজে লাটসাহেবি করছে? কে সে ব্যবস্থা করেছে?

পাকিস্তানের হয়ে দেশের ভিতর থেকে বড়ো খিলাড়ি মেহেবুবা মুফতি ও ফারুক আব্দুল্লা, ওমর আব্দুল্লাও। উপত্যকায় সফল নির্বাচনের জন্য ওরা পাকিস্তান আর জঙ্গিদের ধন্যবাদ দেয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের হয়ে ওকালতি করে। প্রতিনিয়ত ভারতীয় সেনার উপর চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তান ও জঙ্গিদের পথ তৈরি করে, বাঁচিয়ে নেয়। এরাই শুরু থেকে জম্মু-কাশ্মীর শাসন করছে। এদের শাসনেই কাশ্মীরি হিন্দুরা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে, আর পাকিস্তানি জঙ্গিদের ঘাটি ও ভারত বিরোধী পাকিস্তানি মতবাদের আখড়া হয়েছে। এরাই ধারা ৩৭০-এর বড়ো সমর্থক। এরা সকলেই বাইরে থেকে পাকিস্তান ও জঙ্গিবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক, ভিতর থেকে আরও অনেক বেশি।

পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র, সীমার ওপারে। সীমায় তারা আঘাত হানতেই পারে, তা নিজ জমি থেকেই সম্ভব। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে যদি তাদের সহযোগী না থাকে তবে ভারতে প্রবেশ করে বাসা বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সকল সুলুকসন্ধান করে আঘাত হানা অনেক দূরের কথা, এক মুহূর্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। ইতিহাস সাক্ষী, ভারত বার বার বিশ্বাসঘাতক গৃহশত্রুর কারণে পর্যুদস্ত হয়েছে। পাকিস্তান কোনওদিক দিয়েই ভারতের সমকক্ষ নয় তবু ভারতের সব চেয়ে বড়ো বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে ভারতের ভিতরের এই পাকিস্তানিরা। সীমায় পাকিস্তানকে আটকে রাখা বা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা ক্ষমতা ভারতের আছে, তা যে কোনো মুহূর্তেই ভারত করতে পারে। কিন্তু যে দেশে গৃহশত্রু আছে সেখানে বহিঃশত্রুর শক্তি হাজার গুণ বেড়ে যায়। ভারতের ভিতর পাকিস্তান দ্রুত বেড়ে চলেছে সর্বস্তরে। ভারতের বিপদ সীমাপারের পাকিস্তান নয়, ভারতের ভিতরের পাকিস্তান।

পাল্টা আঘাত করে পাকিস্তানের কিছু সেনা মেরে হয়তো গায়ের জ্বালা জুড়াবে, পাকিস্তান শোধরাবে না। ধর্মবিদ্বেষ আর জনবিস্ফোরণের যুগে জঙ্গি মেরে জঙ্গি শেষ হবে না। ভারতের ভিতর ওদের পা রাখার জায়গা যেন না থাকে সেটাই নিশ্চিত করতে হবে। যত বাধাই থাকুক অবিলম্বে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার খর্ব করে বাকি ভারতের সঙ্গে একাকার করুন আর ভারতের ভিতরের পাকিস্তানিদের নির্মম ভাবে নিশ্চিহ্ন করুন মোদীজী। পাকিস্তানকে যে কোনো সময় শাস্তি দেওয়া সম্ভব, আগে গৃহশত্রু বিনাশ করুন মোদীজী, তবেই ভারত নিরাপদ, নতুবা এরাই একদিন ভারতের পতন ঘটাবে। ■

সন্ত্রাসে বিনিয়োগ অনেক দেশের কাছে লাভজনক

অম্লানকুসুম ঘোষ

আবার রক্তাক্ত হলো কাশ্মীর। গত অর্ধদশকের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ সে প্রত্যক্ষ করলো ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে। জঙ্গি বোমা বিস্ফোরণে শহিদ হলেন ৪০ জন ভারতীয় জওয়ান। গোটা দেশ শোকস্তব্ধ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জঙ্গিদের নিখুঁত পরিকল্পিত আক্রমণ সকলকেই বিস্মিত করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও অনুসন্ধিৎসু মনে মাঝে মাঝে উদিত হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীরা এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্রয় ও ব্যবহার করার মতো অর্থ পাচ্ছে কোথা থেকে? সন্ত্রাসবাদকে যারা আদর্শ মনে করে শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত দানের ওপর নির্ভর করে তো এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা সম্ভব নয়। এছাড়াও অন্য অর্থের নিয়মিত সংস্থান নিশ্চয়ই আছে তাদের। অর্থ সংস্থানের সেই আলাদা উৎসটি কী?

অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোনও কাজের জন্য প্রধানত, দু'রকম পদ্ধতিতে অর্থ সংগৃহীত হয়। প্রথমত, দান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ। দান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এই বহুধাবিস্তৃত সন্ত্রাসবাদী চক্র চালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহলে প্রয়োজনীয় অর্থের বাকি অংশ আসে বিনিয়োগ হিসেবে। জিজ্ঞাসু মন এখানেও থমকে দাঁড়ায়। বিনিয়োগ সাধারণত করা হয় লাভের আশায়, সন্ত্রাসবাদ একটি দেশের ক্ষতি করতে পারে ঠিকই কিন্তু অন্য কারও অর্থনৈতিক উপকার করতে পারে কি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে ভারতের সন্ত্রাসদীর্ণ অঞ্চলগুলির আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা সন্ত্রাসদীর্ণ এলাকা কাশ্মীর। প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান ও পরোক্ষভাবে চীনের সমর্থনে পুষ্ট এখানকার জেহাদি জঙ্গিরা ভারতকে আঘাত করে আসছে। কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের লালসাজর্জর দৃষ্টিনিক্ষেপ আজকের কথা নয়, স্বাধীনতার পর থেকেই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাশ্মীরকে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের এত আকর্ষণ থাকার বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, কাশ্মীরের প্রকৃতি যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তুলনারহিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী কাশ্মীর যেন আক্ষরিক অর্থেই ভূস্বর্গ। স্মরণাতীত কাল থেকেই পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এসেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের প্রতি পর্যটকদের এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরকে অনেক উন্নত করে তোলা যেত এবং প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেত। সেই বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কত দেখা যাক। ১৯৬০ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ৯৫.২ লক্ষ ডলার বা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৭০৯১৮ কোটি ডলার বা ৪৪২০৩১৮ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৩৭ কোটি ডলার বা ১৭৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ২৫০০ কোটি ডলার বা ১৫৫৮২৫ কোটি টাকা। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয়ের ৩৯ গুণ ছিল। ১৯৬০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই ৫৪ বছরে সুইজারল্যান্ডের আয়বৃদ্ধি হয়েছে ৭৪৫০০ গুণ। একই সময়কালে কাশ্মীরের আয় বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭০ গুণ। এই সময়কালে কাশ্মীরের আয় বৃদ্ধি যদি সুইজারল্যান্ডের আয় বৃদ্ধির সমহারে হতো তাহলে ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় হতো ২৭৫৬২৭০ কোটি ডলার বা ১৭১৭৯৮১১০ কোটি টাকা যা গোটা ভারতের মোট জিডিপি-র ৮ গুণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর



লক্ষ্য একটাই— উগ্রপন্থার ক্রমবর্ধমান চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় তাহলে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও চীন নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে।

ও সুইজারল্যান্ডের আয় বৃদ্ধির এই বিপরীতমুখী অবস্থানের একটাই কারণ, সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে যত উন্নতি করতে পেরেছে কাশ্মীর তা করতে পারেনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কাশ্মীরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে এত বেশি উন্নতি করলো অথচ কাশ্মীর গহন তিমিরে তলিয়ে গেল। এর একটাই কারণ কাশ্মীরে উগ্রপন্থার জন্য পর্যটকদের স্বাভাবিক ভীতি। এই ভীতি সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান চীনের সাহায্যে। তাদের লক্ষ্য একটাই। উগ্রপন্থার ক্রমবর্ধমান চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় তাহলে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও চীন নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে। ভবিষ্যতের এই লাভের আশায় চীন এবং চীনপ্রদত্ত বলে বলীয়ান পাকিস্তান কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য করে যাচ্ছে বিনিয়োগ হিসেবে। সন্ত্রাসবাদ না থাকলে শুধু কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের সাহায্যেই ভারত আজ বছরে উপরোক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারতো যা ভারতের অর্থনীতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারতো এবং পর্যটন শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানও হতে পারতো।

কাশ্মীরের পরে ভারতের দ্বিতীয় সন্ত্রাসদীর্ণ এলাকা হলো মাওবাদী সন্ত্রাসের আতঙ্কে তটস্থ ভারতের প্রায় আশিটি জেলা। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। অনুর্বর মৃত্তিকাবিশিষ্ট জেলাগুলি কৃষিতে অত্যন্ত পশ্চাদপদ হলেও বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের এই আশিটি জেলায় মাটির নীচে প্রায় ৮০ লক্ষ কোটির (যা ভারতের সাত বছরের বাজেটের সমান) খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হত। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে শিল্পনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এশিয়ার আরেক উদীয়মান শক্তি চীনের বাজার নষ্ট হবে। চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না, আবার অন্য দেশে রপ্তানি করার সময় ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়বে তাই ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদী নামক উগ্রপন্থীদের অর্থ এবং অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করছে চীন। এই অর্থব্যয় এশিয়ার অর্থনীতিতে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য চীনের এক প্রকার বিনিয়োগ। চীন প্রদত্ত অর্থবলে এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা। ফলে ভারতের শিল্পে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

এছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে (অর্থাৎ অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এই সাতটি রাজ্য যারা একত্রে সাত বোন নামে পরিচিত) সন্ত্রাসবাদের অশুভ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতও কৃষিতে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। এখানকার ভূপ্রকৃতি পাহাড়ি ঢালবিশিষ্ট হওয়ায় কৃষিতে এই অঞ্চল খুব পিছিয়ে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্ব অন্য জায়গায়। হিমালয়ের ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি বরফগলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারাবছর। এছাড়াও মৌসুমি বায়ু প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় এই অঞ্চলেই ফলে বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টি এই অঞ্চলেই হয়। পাহাড়ি ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ড গতিতে নিম্নমুখী হয়। ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন বিকল্প শক্তির সন্ধানরত তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু বিকল্প শক্তির বলে বলীয়ান ভারত শিল্পোন্নয়নশীল চীনের মাথাব্যথার কারণও হতে পারে। আবার ভারত বিকল্প শক্তির বলে বলীয়ান হলে পেট্রোলিয়ামের আমদানি কমিয়ে দিতে পারে, যা মধ্য এশিয়ার পেট্রোডলারের বলে বলীয়ান ওপেক দেশসমূহের কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে। তাই চীন এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক উগ্রপন্থী সংস্থাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করছে। এই সাহায্যও তাদের কাছে বিনিয়োগের সমান। এক সময়ে নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এখানকার উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি এখন চীন ও মধ্য-প্রাচ্যের সাহায্যের লোভে নিজেদের আদি উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে বিদেশি শক্তির হাতের পুতুল হয়ে গেছে। তাদের সৃষ্ট অশান্ত পরিবেশ এখানে সরকারকে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে দিচ্ছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি নিজেদের ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী হলেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং ভারত বিরোধিতা করার জন্য পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে দ্বিধা করে না। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্রদের অধিকার রক্ষায় গঠিত উগ্রপন্থী সংস্থা অনুপ্রবেশের মদতদাতা উগ্রপন্থীদের সহায়তা করতে পিছু পা হয় না। সন্ত্রাসের অর্থনীতি পারস্পরিক নীতিগত বৈসাদৃশ্য ভুলিয়ে তাদের এক করে দেয়।

সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী কথা বলেন তাদের এক যুক্তি হলো দারিদ্র্য থেকেই সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। কথাটা সর্বাংশে ভুল। কারণ যে জায়গাগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ সেই জায়গা ছাড়া অন্য কোনও জায়গায় (সেই জায়গা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতর হলেও) সন্ত্রাস হয় না আর সন্ত্রাস যেখানে হয় সেখানকার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিই বেশি হয়। কারণ সন্ত্রাসের অর্থনীতি ব্যস্তানুপাতিক পরিণতিতে অর্থনীতিতেও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের তুষারশুভ্র পর্বতমালাই হোক বা মাওবাদী অধ্যুষিত খনিজ সম্পদপূর্ণ মালভূমি বা ঢেউ খেলানো উপত্যকাবহুল উত্তর-পূর্ব ভারত— সন্ত্রাস বন্ধ হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক পথচলায় সর্বাপেক্ষা উপকৃত হতেন সেখানকার বাসিন্দারাই। ▌

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১২।।



গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতি

দুর্নীতি এবং অপরাধ আজ যেন সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এদের প্রতি ধিক্কার জানানোর মতো মনোবল হারিয়ে ফেলছে মানুষ। এ থেকে পরিত্রাণ মিলতে পারে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে। শান্তি, সংস্কৃতি বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার পূর্বশর্ত সচেতন মানুষের সাহসিক যোগদান।

কে. এন. মণ্ডল

ভারতে নানা ধর্ম, ধর্মাচরণের বিবিধ পদ্ধতি, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যে সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতার ভাব দেখা যায়, তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে সনাতন ধর্মের শিক্ষা। ভারতবাসী বিশ্বাস করে ঈশ্বর আস্তিক-নাস্তিক, জ্ঞানী-মূর্খ সকলের হৃদয়ে বিরাজমান রয়েছেন। এই অনুভব থেকেই এসেছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা—যা স্বামী বিবেকানন্দ গর্বের সাথে বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়েছেন। কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নয়—সনাতন ধর্মের ভ্রাতৃত্ব সকল মানুষের জন্য। পরধর্ম সহিষ্ণুতার এরকম উদাহরণ বিরল।

প্রাচীন ভারতের সহিষ্ণুতানীতির ঐতিহ্যবাহী ভারতকে বারবার বহিঃশত্রুদের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ধর্মস্থান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নামে জোর করে ইসলাম ও পরবর্তীকালে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে দরিদ্র বনবাসী এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের। আজও ধর্মান্তরকরণের কাজ অবাধে চলছে উত্তর-পূর্ব ভারতে, ওড়িশা এবং কেরল রাজ্যে। এ নিয়ে কখনো কখনো অশান্তির খবরও আসছে। ছদ্ম সেকুলাররা এ বিষয়ে নীরব। অথচ হিন্দু সংগঠনগুলি যখন প্রলোভনে ভোলা ধর্মান্তরিত এই গরিব মানুষগুলিকে স্বধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানায় ঘর-ওয়াপসির মাধ্যমে, তখন এই নীরব আন্তর্জাতিকতাবাদী মোড়লরা রে রে করে ওঠেন। তবে, ধর্মান্তর বিরোধী আইন প্রণয়নের কথা উঠলেই এরা চুপসে যান।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সময় আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সংকীর্ণতা এবং আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের মানুষ। লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। হিন্দু মুসলমান ঐক্যে যাতে চিড় না ধরে তা নিশ্চিত করতে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের ধর্মীয় এজেন্ডা 'খিলাফত আন্দোলন' সমর্থন করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। এজন্য গান্ধীজীকে তোষণ রাজনীতির প্রবক্তা বলা যায়। যদিও 'তোষণ এবং বিভাজন' এই রাজনীতি আমদানি করে ব্রিটিশরা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ মদতে ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাকে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য দিয়ে মুসলিম লিগের জন্ম দেওয়া হয়। ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ার সাহেব তখন ঢাকায় কর্মরত। তার উদ্যোগেই ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির উদ্বোধন ঘটে। পিছনের সারিতে চলে যায় জাতীয় সংহতি। অনতিবিলম্বে মুসলিম লিগ মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি 'পাকিস্তান' দাবির স্বপক্ষে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পাশে পায়। বর্তমান ভারতবর্ষে সংগঠিত সন্ত্রাস, জাতি-দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাকার সমস্যার মূলে রয়েছে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের বিষময় ফল। ভারতীয় কমিউনিস্টরা অবশ্য মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করে মুসলমানদের 'Right of self determination' মোড়কে—অর্থাৎ মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অথচ, মুসলিম লিগ নেতারা হিন্দুদের ব্যাপারে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন তা গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের একটি উক্তিতে প্রতিফলিত হয়। 'আমি ভাবতে পারি না ক্যাবিনেট মিশনে সুরাবর্দির হিন্দু বিরোধী ভূমিকার পরেও এরকম একজন ব্যক্তির সঙ্গে কী করে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব দেন শরৎচন্দ্র বসুর মতো লোকেরা।'

বামপন্থী এবং ক্ষমতালিপ্সু কংগ্রেস



ওড়িশায় 'ঘর ওয়াপসি'।

ফঃ ৬

মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে পাকিস্তান প্রস্তাবে রাজি হলেও, হিন্দুদের রক্ষাকবচের কোনো ব্যবস্থা করেনি। বাঙ্গালি হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য ভবিষ্যত দ্রষ্টা রাজনীতিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াসে পাকিস্তানের হাত থেকে পশ্চিমবাংলাকে ছিনিয়ে আনা হয় বাংলা ভাগ করে—তা না হলে যুক্ত বাংলায় হিন্দুদের অবস্থা হতো কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো। কলিকাতা হাতে না পাওয়ার খেদ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ্, তাঁর মতে তাঁরা পেয়েছেন পোকায়-কাটা পাকিস্তান। আজ সেই পশ্চিমবঙ্গ-পশ্চিম বাংলাদেশ হবে কি না, বাঙ্গালিদের তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে, ১৯৩৭ সালে ফজলুল হককে সমর্থন না করে, বাংলার কংগ্রেস মুসলিম লিগের ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দেয়। তারপর আর মুসলিম লিগকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এখনো সময় আছে, জাতীয়তা বিরোধীদের মদত না দিয়ে 'জাতীয় সংহতি'র কথা ভাবার।

ঐতিহ্যগতভাবেই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার শেকড় গ্রথিত রয়েছে ভারতের সংস্কৃতিতে এবং দর্শনে। ভারতের ৮৫ শতাংশ মানুষ হিন্দু বলে তাদের পরিচয় দিলেও, নির্দিষ্ট কোনও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নন, তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর। পালন করা না করা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। হিন্দুধর্ম শুধুমাত্র আচারভিত্তিক না হয়ে, বর্তমানে আনুষ্ঠানিক বা উদ্‌যাপনের রূপ নিয়েছে। যেখানে অংশগ্রহণ অবারিত, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ধাঁচের। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম কোনো রেজিমেন্টেড রিলিজিয়ন না হয়ে এক উদার পরমত সহিষ্ণু ধর্মে পরিণত হয়েছে। একেবারেই নিরীহ ধর্ম, তাই বারবার ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে হিন্দু ধর্মকে। বর্তমানে এক ধরনের হিন্দুদের মধ্যে যে নিস্পৃহ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় যা তা নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে কি না, সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবে দেখতে পারেন।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে সেকুলার শব্দটি যোগ করেন। পৃথিবীর কোনও দেশেই এই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাবে না—এমনকী পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নয়। তার মানে কিন্তু এই নয় ওই সমস্ত দেশের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ১৯৭৬ সালের আগে ভারতের সংবিধানে ওই শব্দটি যুক্ত ছিল না। তার মানে কি দেশ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না? এহেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকেও ১৯৮৩ সালে একটি মাইনরিটি ডেপুটেশনকে বলতে শোনা যায়, ''Minorities can not claim to be safe by constantly irritating the majority.'' শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে সংখ্যালঘুদেরও ভূমিকা নিতে হবে, একথার মানে তো তাই দাঁড়ায়। মুসলমানদের জন্য আলাদা Civil Code বজায় রাখার দাবি জাতীয় সংহতির অন্তরায় নয় কি?

গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো এবং তার সফল রূপায়ণ ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির পরিপূরক। প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রে প্রজাদের জন্য দায়বদ্ধতা এবং তাদের জন্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাজন্যবর্গের দুশ্চিন্তা ও সহযোগিতা ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ ছিল। যা বর্তমানে ভারতবর্ষে বহুলাংশে বিরল। জনগণের টাকা লুট এবং দুর্নীতির মাধ্যমে ক্যাডার পুষে রাজনৈতিক ক্ষমতা আগলে রাখার পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি। জনসেবার নামে 'রাজনীতি' জনগণের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এরাই আবার ক্ষমতাচ্যুত হলে নিরীহ গিনিপিগে পরিণত হয় কিছুদিনের জন্য। আবার দল বদলের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসে, এটাই সাধারণের অভিজ্ঞতা। এরা যখন ক্ষমতায় থাকেন প্রচারের আলোতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেদের 'সার্বভৌম' এবং সবজান্তা মনে করেন। আর সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবেন। যে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসায় ২৯ জনের মৃত্যু হয়, ৫৭৩টি বুথে পুনর্নির্বাচন করতে হয় হিংসা ও বুথ দখলের ঘটনায়, যেখানে প্রতিদিন খবরের শিরোনাম হয় ধর্ষণ এবং মৃত্যু দিয়ে—প্রকাশ্য দিবালোকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বা সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে, সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর রাজ্য শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ স্থান। অথচ ভারতের ৫টি রাজ্যে ডিসেম্বরে বিধানসভার ভোটে একজনেরও মৃত্যুর খবর নেই, কেবলমাত্র ছত্তিশগড়ে ভোটের আগে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর মাওবাদী হামলা এবং জীবনহানির ঘটনা ছাড়া। এ রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতায় যত্রতত্র বিষমদের ঠেকগুলিতে বিষপান করে মৃত্যু ঘটছে গরিব মানুষের, জনগণের করের টাকায় ক্ষতিপূরণ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে 'মদ' নিষিদ্ধ করে সামাজিক সুস্থিতি ফিরিয়ে দিচ্ছে সরকার। ভোট রাজনীতি না করে সরকার প্রশাসনিক দক্ষতা দেখালে জনগণ উপকৃত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি প্রসঙ্গে ৯০-এর দশকের প্রথমদিকের একটি ঘটনা উল্লেখ্য। পশ্চিমবঙ্গে বাস-মালিকরা বাস ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন করছেন। ১/২ দিন বাস ধর্মঘটও হয়েছে। বামফ্রন্টের ম্যানেজারেরা, বিশেষ করে পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর দাবি, কলিকাতায় ৪টাকা ন্যূনতম ভাড়া শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। এই প্রতিবেদক তার কয়েকদিন আগেই মুম্বাই এবং হায়দরাবাদ শহরে ন্যূনতম ২টাকা ভাড়ায় বাসে চড়ে এসেছেন। আজ হয়তো রবি ঘোষ বেঁচে থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলতেন, ''আস্তে বলুন, শুনলে ঘোড়ায়ও হাইসবো।''

বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতি একটি ফরিবিডেন ফ্রুটে পর্যবসিত হয়েছে। সবাই জানে ওটা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য কিন্তু অনেকেই লোভ সামলাতে পারছেন না, তার প্রভাব পড়ছে সমাজ জীবনে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্ফালনে দুর্বৃত্তরা নিরীহ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষকে উত্যক্ত করছে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে ঢুকে পড়ছে। তাইতো, নেতাজীর বাড়িতেও তোলাবাজরা স্বগর্বে ঢুকে পড়ার সাহস দেখাচ্ছে। দুর্নীতি এবং অপরাধ যেন সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এদের প্রতি ধিক্কার জানানোর মতো মনোবল হারিয়ে ফেলছে মানুষ। এ থেকে পরিত্রাণ মিলতে পারে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে। শান্তি-সংস্কৃতি বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার পূর্বশর্ত সচেতন মানুষের সাহসিক যোগদান।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন মুখ্য প্রবন্ধক)

পূজা ও জ্যোতিষ গণনা প্রাচীন পঞ্জিকা মতে হওয়াই শাস্ত্রসম্মত

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

আবহমানকাল ধরেই ভারতে পূজা এবং জ্যোতিষ গণনা প্রাচীন (অদৃক সিদ্ধ) পঞ্জিকা অনুসারেই হয়ে এসেছে। এই প্রাচীন পঞ্জিকা প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত এবং সর্বজনমান্য শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ অবলম্বনে গণিত। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রন্থের সূত্রাবলী দিয়ে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহের অবস্থান গণনা করলে আকাশের প্রকৃত গ্রহ অবস্থানের সঙ্গে মিলে না, একথা বলা হচ্ছে। তাই সঠিক গ্রহাবস্থান বা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকার উদ্ভব হয়। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯০) দৃক্ সিদ্ধ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এবং অন্যান্যদের উদ্যোগে দৃক সিদ্ধ পঞ্জিকার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই পঞ্জিকা। একেই সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পঞ্জিকা বলে দাবি করা হয়। তাই অনেকের মতে পূজা ও জ্যোতিষ গণনা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারেই হওয়া উচিত। আমরা দেখেছি, জড়বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়-নির্ভর সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই পরিবর্তন হয়। তাই গ্রহাবস্থানের দৃকসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যে সঠিক সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়তো আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করিতে পারি।' কিন্তু যথার্থ সত্য কখনোই পরিবর্তিত হয় না।

তাছাড়া, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার জন্মের আগে হাজার হাজার বছর যাবৎ পূজা ও জ্যোতিষ গণনা কি অশুদ্ধ এবং অবৈজ্ঞানিক ছিল? আর বর্তমানে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে পূজা ও জ্যোতিষ গণনা হলেই তা হবে শুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক? আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূজা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্তক নন। বৈদিক ঋষিরাই পূজা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্তক। তাই বেদ ও স্মৃতি সম্মত আচারই ধর্মের মূল। তাহলে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী পূজা ও জ্যোতিষ গণনা হবে কেন?

আমরা জানি, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এক জিনিস নয়। কারণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি জড়বিজ্ঞান। এর কাজ জড়জগৎ নিয়ে। আর জ্যোতিষশাস্ত্র হলো মানব বিজ্ঞান। এটা মানুষের জীবন ও চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার প্রতীকি তত্ত্বভিত্তিক গাণিতিক পদ্ধতি। এখানে স্মরণে রাখা দরকার, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্র গড়ে উঠেনি, জ্যোতিষশাস্ত্রের গর্ভেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান। বিশ্ববিখ্যাত Alan Leo লিখেছেন— ''The origin of Astrology is lost in the mists of antiquity. It is the soul of Astronomy..." (PRACTICAL ASTROLOGY)।

আবার, ঈশ্বর যেহেতু দৃক্ সিদ্ধ নন, তাই তাঁর পুজোও দৃক্ সিদ্ধ পঞ্জিকা অনুসারে হতে পারে না। তাই আকাশের গ্রহ নামক জড়পিণ্ডগুলির সঠিক বা বেঠিক অবস্থানের সঙ্গে পূজার কোনও সম্বন্ধ নেই। ঈশ্বর এদের উপর নির্ভরশীল নন। এই কারণেই পূজা এবং জ্যোতিষ গণনা প্রাচীন পঞ্জিকা অনুসারে হওয়াই শাস্ত্রসম্মত। এবং দৃক্ সিদ্ধ পঞ্জিকা অনুসারে পূজা অশাস্ত্রীয়। যেহেতু, পূজার সঙ্গে তথাকথিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জড়বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। মা দুর্গার নৌকায় আগমন ও ঘোড়ায় গমন— এই জাতীয় কথার কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা আছে কি? যদি না থাকে তবে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রহ সংস্থানের উপর নির্ভর করে পূজা হবে কোন্ যুক্তিতে?

ঋষিরা যে পঞ্জিকা অনুসারে পূজার নির্দেশ দিয়েছেন তা অদৃক্ সিদ্ধ অর্থাৎ যা প্রতীকি তত্ত্ব ভিত্তিক। ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদির অবিষয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে যে গ্রহের কথা বলা হয়েছে তাও প্রত্যক্ষাদির অবিষয়। আমরা মাটি, খড় ও বাঁশ দিয়ে তৈরি প্রতিমার পূজা করি না। পূজা করি প্রত্যক্ষাদির অবিষয় মহাশক্তি বা ঈশ্বরের। প্রতিমা এখানে প্রতীক। জ্যোতিষশাস্ত্রেও যে গ্রহ সমাবেশ বা গ্রহাবির্ভাব বা একটি গ্রহের সঙ্গে অপর কোনও গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে গাণিতিক কতকগুলি অঙ্কের ব্যবহার করা হয় তাও প্রতীকি ব্যবস্থা। সুতরাং আকাশীয় জড়পিণ্ড বা গ্রহগুলির সঠিক বা বেঠিক অবস্থানের উপর পূজার কোনও সম্বন্ধ নেই। তাই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক তিথি নির্ণয় করে পূজা ও জ্যোতিষ গণনা করতে হবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। এই কারণেই, প্রাচীন পঞ্জিকা অর্থাৎ সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিথি নির্ণয়ই শাস্ত্রসম্মত।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকারদের বক্তব্য : ''সূর্যসিদ্ধান্তে বীজ সংস্কার প্রয়োগ না করিলে গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান পাওয়া যায় না ফলে গ্রহণ গণনাদি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হয়। এই জন্য জনসাধারণের কাছে হেয় হওয়ার ভয়ে অদৃকসিদ্ধ প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকাকারেরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়গুলির জন্য সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ গণনার উপর নির্ভরশীল থাকেন এবং Indian Astronomical Ephemeris প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি অন্যান্য তথ্যাদি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই গণনা করেন।" —বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকারদের এই বক্তব্যের উত্তরে বলা যায় যে, গ্রহণ গণনা জ্যোতির্বিজ্ঞান নামক জড়বিজ্ঞানের বিষয়। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের কার্যালয় থেকে গ্রহণ গণনার তথ্যাদি সংগ্রহ করা দোষের নয়। কিন্তু পূজা ও জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনা অদৃক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কারণ, পূজা ও জ্যোতিষ গণনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ নয়। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূজা ও জ্যোতিষ গণনা করেন না। ■

জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ চাইছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীর উপত্যকায় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে লাগু থাকা ধারা ৩৫-এ কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। এই ধারা অনুযায়ী অকাশ্মীরিরা উপত্যকায় জমি জমা কেনা থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করা বা স্থায়ী ভাবে বসবাস করা থেকে বঞ্চিত হন। সাম্প্রতিক পুলওয়ামায় নৃশংস জঙ্গি আক্রমণ ও ৪৪ জন জওয়ানের অপমৃত্যুর পর এই আইনের অবলুপ্তি নিয়ে দেশ জুড়ে শোরগোল পড়েছে।

এমন কিছু ঘটলে যে এতকালের মৌরসিপাট্টার দিন শেষ হবে তার আঁচ পেয়েই চরম হুমকি দিয়ে রাখলেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালের প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে এই ধারার বিলুপ্তি ঘটলে অবস্থা সেই সময়কার থেকেও খারাপ হয়ে যাবে। সূত্র অনুযায়ী মুফতি এমন হুমকিও দেন যে পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠতে পারে যে উপত্যকায় তিরঙা ঝান্ডা তোলার লোকও হয়তো পাওয়া যাবে না। এই সূত্রে রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের প্রসাসন তাঁর উকিলদের সর্বোচ্চ আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানোর নির্দেশ দিলেও মেহবুবার বিষোদ্গারে ভাটা পড়েনি।

প্রসঙ্গত, দিল্লিস্থিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মহামান্য আদালতে ধারা ৩৫-এ চরিত্রগত ভাবে সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিয়ে এটি খারিজ করার দাবি জানায়। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কৌঁশুলি রোহিত কানসাল এই মর্মে সাংবাদিকদের জানান যে অতীতে রাজ্য সরকার বিষয়টির সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে বারবার এই শুনানি পিছিয়ে দেবার আবেদন করেছে। তিনি আরও বলেন বর্তমানেও রাজ্য সরকারের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারও এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহমত থেকেছে। বিশ্বস্ত সূত্র মোতাবেক পুলওয়ামার নৃশংস ঘটনার পর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আবেদনটির দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছে এমনটাই খবর। শুধু তাই নয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে সরকার জরুরি ভিত্তিতে অধ্যাদেশ জারি করার কথাও বিবেচনায় রেখেছে। যা আদতে ৩৭০ ধারা বলে জম্মু কাশ্মীরে 'বিশেষ সুবিধে' ভোগ করায় ইতি টানবারই উদ্যোগ। এই ধরনের খবরাখবরের পরিপ্রেক্ষিতে মেহবুবা উপত্যকায় বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠার হুমকিও দেন। বিক্ষুব্ধ মেহবুবা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বিশ্বত্রাস জঙ্গি ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ফাঁসি হওয়া আফজল গুরুর অনুষঙ্গ টেনে এনে এবারও ভোটের আগে দেশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অভিযোগ করতেও ছাড়েননি।

সেনার অধিকার রক্ষা করার আবেদন শুনবে সর্বোচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীর ও অন্যান্য প্রতিকূল অঞ্চলে কর্তব্যরত সেনাবাহিনীর জওয়ান ও আধিকারিকদের দায়িত্বপালনের সময় অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যে ভয়ংকর পাথর ছোঁড়া চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে দু'জন সামরিক কর্মীর পুত্র কন্যা মহামান্য আদালতের কাছে তাদের জন্মদাতা সৈনিকদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে আবেদন করেছে।

এক কর্মরত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের মেয়ে প্রীতি কেদার গোখলে ও অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদারের ছেলের আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও বিচারপতি সঞ্জীব মল্লারের যুগ্ম বেঞ্চ মানবাধিকার কমিশন, জম্মু-কাশ্মীর সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই মর্মে তাদের দ্রুত মতামত জানবার জন্য নোটিশ দিয়েছে। আবেদনকারীরা তাদের আর্জিতে জানিয়েছে যে তাদের অভিভাবকরা কর্তব্যরত অবস্থায় যখন স্থানীয়দের নিক্ষিপ্ত পাথরে মারাত্মক রকম জখম হওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়ছে তখন কী কেন্দ্রীয় সরকার কী রাজ্যসরকার উভয়েই সেনাবাহিনীর প্রাপ্য মানবাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। উপরন্তু পাথরবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সরকার পাথরবাজদের ওপর আনীত ৯৭৬০টি এফ আই আর ফেরত নেওয়ার আদেশ জারি করেছে। পাথরবাজরা আদতে জইস-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা ও হিজবুলের মদতে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু নিরাপত্তারক্ষীই ইতিমধ্যে গুরুতর জখম হয়েছেন। কিন্তু অসহায় এই নিরাপত্তাকর্মীদের উল্টে আদালতে পাথরবাজদের আক্রমণ করার অভিযোগে মামলায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতে একটি অভূতপূর্ব ঘটনায় দেখা গেল নিরাপত্তারক্ষীর সন্তান প্রীতি কুমারী গোখলের কৌঁশুলি শ্রীমতী মীনাক্ষী অরোরা তাঁর মক্কেলের তরফে আবেদনপত্র পড়ার আগেই প্রধান বিচারপতির যুগ্ম বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে।

এই সূত্রে আবেদনকারীরা মহামান্য আদালতের কাছে জনান যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কাজের কারণে এফ আই আর হলে আইনগতভাবে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিজ দেশ ও নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তারা যখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিংস্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লড়ছেন, তখন সেই ভয়ংকর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তারা ন্যায়সঙ্গত বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর্জি না শুনেই নোটিশ জারি করে আদালত প্রমাণ করল তারা সেনাবাহিনীর পাশেই আছে।

আমাদের কাছে দেশ বড়ো : প্রধানমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের কাছে দেশের চেয়ে পরিবার বড়ো। পুলওয়ামার হামলা এবং তারপর ভারতের সাম্প্রতিকতম সার্জিকাল স্ট্রাইকের আবহে এভাবেই কংগ্রেসকে সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকের উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশ বড়ো, না পরিবার? কোনটা বড়ো আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে দেশটাই বড়ো। কিন্তু অনেকেই আছেন, যাদের কাছে দেশ বা দেশের স্বার্থ বড়ো নয়। তাদের কাছে পরিবার এবং পারিবারিক স্বার্থই বড়ো। তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ হলো, বোফর্স থেকে অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড সবকটি তদন্তেই একটি বিশেষ পরিবারের দিকে বারেবারে আঙুল উঠেছে।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'এই পরিবারগুলি শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছেন বলেই গত সাড়ে পাঁচ দশকেও এই রাষ্ট্রীয় স্মারক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। আজ এতদিন পরে রাষ্ট্রীয় স্মারকের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত।

নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছেই এই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। স্মারক উদ্বোধন করে দেশের আত্মবলিদানকারী সেনা জওয়ান এবং প্রাক্তন সেনানীর স্মরণে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৬১ সালে নিহত জওয়ানদের স্মৃতিতে এই রাষ্ট্রীয় স্মারক নির্মাণের দাবি উঠেছিল। কিন্তু গত সাড়ে পাঁচ দশকে দু-দুবার লোক দেখানো উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি। আমরা ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই যুদ্ধ স্মারক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এই কার্যকালের ভিতরই তা সম্পূর্ণ করলাম।

সেনাবাহিনীকে কংগ্রেস কখনই যথাযথ মর্যাদা দিতে চায়নি এই অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাফাল বিমান যাতে আমাদের হাতে না আসে তার জন্য কংগ্রেস নিত্য নতুন গুজব ছড়াচ্ছে। দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ আমাদের সরকার ভারতীয় সেনাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা সেনাবাহিনীতে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার সেনাবাহিনীতে এক পদ, এক পেনশন' চালু করার পর জওয়ানদের পেনশন প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

পুলওয়ামার জঙ্গি গাড়িটির মালিক সাজ্জাদ ভাট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কনভয়ে যে লাল মারুতি গাড়িটি নিয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি আদিল আহমেদ দার হামলা চালায়, সেই গাড়িটি সাতবার হাতবদল হয়েছিল। তদন্তে নেমে এমনই জানতে পেরেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এন আই এ)। তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে, চলতি বছরই এই গাড়িটি কেনে জইশ-ই-মহম্মদের অন্যতম জঙ্গি সাজ্জাদ ভাট। তার কাছ থেকেই গাড়িটি নিয়ে গিয়ে আদিশ আহমেদ দার আত্মঘাতী হামলা চালায়।

এন আই এ গোয়েন্দারা তদন্ত চালাতে গিয়ে প্রথমেই বুঝতে পারেন, এই গাড়িটির মালিকানা কার তা খুঁজে বের করা থেকেই অনেক রহস্যের সমাধান হবে। সেই খোঁজ করতে গিয়েই নানাবিধ তদন্ত উঠে আসে



সাজ্জাদ ভাট

গোয়েন্দাদের হাতে। প্রথম থেকেই গোয়েন্দাদের সন্দেহ ছিল, হাতবদল হয়ে গাড়িটি জঙ্গিদের কাছে এসেছে। ঘটনাস্থল থেকেই গাড়িটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও ডাকা হয়। গাড়ি কোম্পানি থেকেই সংগ্রহ করা হয় গাড়িটির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর। গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ২০১১ সালে গাড়িটি কেনেন অনন্ত নাগের বাসিন্দা মহম্মদ জলিল আহমেদ হাক্কানি। তিনি গোয়েন্দাদের জানান, অনেক আগেই তিনি গাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছেন। এরপর খোঁজখবর করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, সাতবার গাড়িটি হাতবদল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গাড়িটি ছিল অনন্তনাগেরই সাজ্জাদ ভাটের কাছে।

গোয়েন্দা তদন্তে জানা গিয়েছে যে, সাজ্জাদ ভাট কিছুদিন আগেই জইশ-ই-মহম্মদে নাম লিখিয়েছে। পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণও নিয়েছে। পুলওয়ামার আত্মঘাতী জঙ্গি আদিনোর সঙ্গে তার যোগাযোগের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। দুজনের মধ্যে একাধিকবার কথা হয়েছে বলেও প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তবে সাজ্জাদ আপাতত গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ সে উপত্যকাতেই রয়েছে। তার সন্ধানে খোঁজ চলবে।

বায়ুসেনা বুঝিয়ে দিল ভারতের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাত্র একুশ মিনিটের অপারেশন। তাতেই জইশ-ই-মহম্মদের তিনটি লঞ্চিং প্যাড সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কন্ট্রোল রুম ধূলিসাৎ। সব থেকে বড়ো কথা, ১২টি বিমান একুশ মিনিট ধরে বোমাবর্ষণ করল অথচ পাকিস্তানের রাডারে তা ধরা পড়ল না। পরিকল্পনা কত নিখুঁত হলে এইভাবে শত্রুর ঘাঁটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এবং ভারতের ১২টি বিমানের গায়ে সামান্যতম আঁচড়ও পড়ে না। বায়ুসেনা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল ভারতের সামরিক শক্তির সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। যতবারই মুখোমুখি হোক না কেন এভাবেই পর্যুদস্ত হবে পাকিস্তান এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। অনেকে হয়তো বলবেন, ভারতীয় বায়ুসেনা তো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি, তাহলে তাদের পর্যুদস্ত হবার কথা উঠছে কেন? একথার উত্তরে বলা যায়, যুদ্ধ সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে না হলেও পরোক্ষভাবে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের জাতীয় নীতির অন্যতম অঙ্গ হবার সুবাদে জইশ-ই-মহম্মদের মতো শতাধিক জঙ্গি সংগঠন যে দেশের অর্থে এবং সামরিক মদতে বেড়ে উঠেছে।



এইসব সংগঠনের নিরাপত্তার প্রাথমিক দায়িত্ব পাকিস্তানের ওপর বর্তায়। সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে তাসের ঘরের পর্যায়ে নামিয়ে এনে পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে জইশের শেকড় উপড়ে ফেলা হলে তা কার্যত পাকিস্তানের পরাজয় হিসেবেই বিবেচিত হবে।

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখনও পর্যন্ত সব খবর আসেনি। কিন্তু যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট বিস্ময়কর। এই এয়ার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভারত বারোটি মিরাজ ২০০০ বিমান ব্যবহার করেছে। অপারেশন শুরু হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে। মাত্র একুশ মিনিটে ভারতীয় বায়ুসেনা ১০০০ কেজি বোমাবর্ষণ করে। এই বিস্ফোরণে জইশের বালাকোট, মুজাফ্ফরাবাদ এবং চাকোটির লঞ্চিং প্যাড সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে গেছে জইশের আলফা নামক কন্ট্রোল রুমটিও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই তিন কেন্দ্রেই ছিল জইশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই তিনটি লঞ্চিং প্যাড ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জইশের কোমর ভেঙে গেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব হলো এই অসাধ্যসাধন? ভারতের বায়ুসেনার অস্ত্রভাণ্ডারে অজস্র মণিমাণিক্যের মধ্যে মিরাজ ২০০০ অনেক কম উচ্চতায় উড়তে পারে। এয়ার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে তাই ব্যবহার করা হয়েছে মিরাজ ২০০০। অনেক নীচ দিয়ে ওড়ার ফলে মিরাজের উপস্থিতি টের পায়নি পাকিস্তানি রাডার। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ৮৮ কিলোমিটার ঢুকে যায় মিরাজ ২০০০ এবং বোমাবর্ষণ করে উড়িয়ে দেয় জঙ্গি শিবিরগুলি।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা



দেশপ্রেমের দলিল ‘উরি’

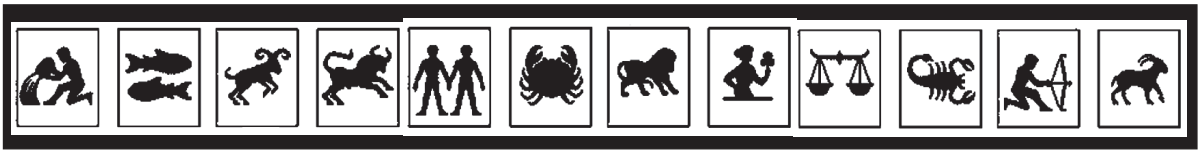
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৪ সালের ৬ জুন তারিখটি ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হতমান, রণক্লান্ত মিত্রশক্তির সৈন্যরা ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে হিটলারের নাজি বাহিনীকে মরণ কামড় দিয়ে জয় হাসিল করেছিল। দিনটি ডি. ডে নামে খ্যাত। মলিন ইতিহাসের পাতা পেরিয়ে ২৮ মধ্যরাত্রি থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬-র প্রত্যুষ অবধি ভারতীয় বায়ু সেনার কমান্ডোরা প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ‘সার্জিকেল স্ট্রাইক’ করে। এই আক্রমণের আগে ১৮.৯.২০১৬ তারিখে পাকিস্তানের ‘জইশ-এ-মহম্মদের’ সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের উরি সেনা ছাউনিতে নৈশ আক্রমণে ১৯ জন নিদ্রিত সৈনিকের প্রাণ নেয়। ‘সার্জিকেল স্ট্রাইকে’ মৃতের সংখ্যা ৫০, তবে কিছুটা বিতর্কিত কেননা সেগুলি পাকিস্তানের এক্তিয়ারে ছিল। এই গোটা ঘটনায় ভারতীয় সেনা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে। এই দিনটি সার্জিকেল ডে। বিচিত্র দেশ এই ভারতে সেনা বাহিনী ও সরকারকে খাটো করতে কোনো কসুর না করে কিছু বিরোধী নেতা এই আক্রমণের সত্যতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। এটা মানুষ জানে। তবে শক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে এমন অভূতপূর্ব সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে কাশ্মীরেরই ছেলে চলচ্চিত্র পরিচালক আদিত্য ধর বানিয়েছেন ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সত্যনিষ্ঠ চলচ্চিত্র ‘উরি’। ছবিটিতে এই আক্রমণের পরিকল্পনা, পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি অসীম যত্নে তুলে ধরা হয়েছে। বাছাই করা কম্যান্ডোদের নিয়ে বাহিনী তৈরি, অতি প্রতিকূল পরিস্থিতির মেকাবিলায় তাদের অনুশীলন পরিচালক পূর্বাপর তুলে ধরেছেন। আক্রমণের সময় কম্পিউটার ক্লক-এ আসল সময় পর্যন্ত প্রদর্শিত। বিরোধী কিছু স্বার্থান্বেষী, মূর্খ রাজনীতিকদের এ চলচ্চিত্র মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত। এর প্রয়োজন ছিল। পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারের ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, জাতীয় গর্ব অনুভব করে। এ ছবির সংক্ষিপ্ত সাংসারিক দৃশ্যাবলীর নির্মাণে পরিচালক আলঝাইমার রোগাক্রান্ত মা ও ছেলে, যুদ্ধে স্বামী হারানো বোন ও ভাগনির আবেগঘন সংলাপ ও অভিনয় সহজ পারদির্শতায় তুলে ধরেছেন।

পরিচালক এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সেনাবাহিনীর প্রতি আকর্ষণ অনুভবের কথা জানিয়ে বলেছেন, ‘উরি’ ভারতীয় সেনার সর্বকালীন সেরা covert (সন্তর্পণ) operation। কম্যান্ডো অপারেশনের প্রধান ভিকি কৌশলের শারীরিক শৌর্যের বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাস্য। গভীর রাতের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে যে ধ্বনি ও মরণপণ চিৎকার ডাবিং করা হয়েছে তা খুব উচ্চদরের হলিউড ছবিকে অবলীলায় হার মানাবে। কিছু কৌশলী ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতীয়রা চরিত্রগতভাবেই অনুভূতিপ্রবণ ও দেশপ্রেমিক। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ভারতীয় সেনার চাক্ষুষ অমিত বিক্রমে মানুষ তাদের উল্লাস প্রকাশে কার্পণ্য করছে না। দেশবাসী যে মর্মে মর্মে ভারতীয় হিসেবে গর্বিত তার প্রমাণ কোনো নাচনেওয়ালি, সরাবওয়ালা ছাড়াই এ ছবি ইতিমধ্যে রেকর্ড ভেঙে ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

তবে, অনামী অভিনেতারা সেনা জওয়ান কম্যান্ডো বা অফিসারের ভূমিকায় যে স্বর্তঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছেন তার অভাব রয়েছে অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। এখানে রক্তমাংসের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী, নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রমুখেরা উপস্থিত। নিরাপত্তা উপদেষ্টা পরেশ রাওয়াল পোড়খাওয়া অভিনেতা। তাঁর অজিত ডোভাল চিন্তার সাফল্যের অনুভূতিতে অনবদ্য। কিছু করার নেই। রাজনাথ সিংহকেও প্রায় সংলাপহীনই রাখা হয়েছে। তবে দক্ষ অভিনেতা রজত কাপুরের কণ্ঠ ও চেহারা বজ্রকঠিন মানসিকতার প্রধানমন্ত্রী চরিত্রের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় নিতান্তই হতাশ করলেন। এ ছবিটি প্রতিটি ভারতীয়ের অনুপ্রেরণাস্থল হতে পারে। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



৪ঠা মার্চ (সোমবার) থেকে ১০ই মার্চ (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে মঙ্গল, কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে কেতু, কুম্ভে রবি, মীনে বুধ। বুধের বক্রীরূপ পরিগ্রহ হচ্ছে বুধবার। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে শ্রাবণা নক্ষত্র থেকে মেষে অশ্বিনী নক্ষত্র।

মেষ ঃ উচ্চপদে যোগদান, প্রশাসনিক সহযোগিতা, কথাবার্তায় প্রফুল্লতা। বিদ্যার্থীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় সাফল্য। মাতার শরীর বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার। সপ্তাহের প্রান্তভাগে চপলতা। স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধুলাভ ও নার্ভের চিকিৎসা দরকার, ব্যয়বাহুল্যে উদ্বেগ।

বৃষ ঃ প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃস্থানীয়ের সঙ্গে ব্যবহারে মানসিক ক্লেশ। চাকরিজীবীদের পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি হলেও আর্থিক বিষয়ে ততটা সন্তুষ্টি নয়। প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয়ে বকেয়া পাওনা প্রাপ্তি। প্রেমর তরণীতে অবাধ বিচরণ। লোহা-কাষ্ঠ-চর্মজাত তরল ব্যবসায় বিনিয়োগে আকস্মিক শ্রীবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও সন্তানের নিজ–নিজ প্রতিভার বাস্তবায়ন।

মিথুন ঃ পুলিশি ঝামেলা ও মামলা মোকদ্দমায় বিজয়ীর সম্মান। মেশিনশপ, ছাপাখানা, হোটেল, রেস্তেরাঁ, কৃষিকাজ, জলাশয় বিষয়ে নিজ অবস্থানে অনড় ও অনায়াস সাফল্য। মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থিক উজ্জ্বল দিক। হঠাৎ প্রাপ্তি।

কর্কট ঃ কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শংসা অর্জন। পারিবারিক অসুস্থতায় উদ্বেগ ও অবসাদ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের সম্ভাবনা। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-সৃষ্টিশীলতা-সাহিত্য ও বেদবিদ্যায় জীবিকানির্বাহকারীদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও লোকসন্তুষ্টি। সন্তান-সন্ততির কর্মকুশলতায় প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহচার্য ও ভ্রমণের সুযোগ।

সিংহ ঃ গুরুজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যোন্নতিতে স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসংগতিতে শান্ত ও সংযতভাবে পদক্ষেপ নিন। হিসাব রক্ষক, অডিটার, তথ্যপ্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ার, রিসার্চ স্কলারের প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। সাংসারিক সমৃদ্ধিতে গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ফলপ্রসু। আচমকা জোরে আঘাত যোগ।

কন্যা ঃ কর্তব্যে ত্রুটি, ভ্রাতৃ ও প্রতিবেশীর বিরূপতা, স্ত্রী বিরোধ, গুপ্ত শত্রুতায় হতাশার মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগ কার্যকরী। প্রেম ও বিরহে ভালবাসার হৃদয়বেদনা সপ্তাহের শেষপাদে জীবনের ঝরাপাতায় নব বসন্তের প্রলেপ।

তুলা ঃ যুবক-যুবতীদের প্রেম-প্রণয় ও পত্নীরূপের সার্থক প্রয়াস। কর্ম ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও বেকারত্বের অবসানে সফল মনস্কাম। সহকর্মীর অবাঞ্ছিত ব্যবহার ও নতুন দায়িত্বে মানসিক উদ্বেগ, বয়স্ক মিত্র প্রগতির প্রশস্ত পথের প্রদর্শক। ঋণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

বৃশিক ঃ বিদ্যা, কর্ম, শিল্প, কলাকুশলী, সমাজকল্যাণ, প্রতিবেশী ও সজ্জনের সান্নিধ্যে যশ-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। উচ্চশিক্ষা, পেশাগত উন্নতিতে প্রবাস। কাষ্ঠ, প্রস্তর, পশুপালক, নির্মাণ সংস্থায় কর্মরত ও বাহন চালকদের সংসর্গ এড়িয়ে চলা হিতকর। জেদ বিবাদের পথ প্রদর্শক। আচার্য্য-প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিচারক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজসঙ্গ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

ধনু ঃ উদারতা, নীতিনিষ্ঠ, মানবহিতৈষী, নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবনায় প্রতিকুল পরিবেশের অবসানে বৈষায়িক সমৃদ্ধি। বিত্ত ও অভিজাত গৌরব কর্মদক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষার বাস্তবায়ন, পদোন্নতি, প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী পরিবারে সন্তান-সন্ততির বিবাহ, বেকারদের কর্মসংস্থান, সুন্দরের পূজারী ও সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর মন।

মকর ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। আর্থিকগতি শ্লথ। কোনো রমণীর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পারিবারিক সুস্থিতি বিনষ্ট। ব্যবসায় বিনিয়োগে ও লিখিত চুক্তিতে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতায় বাস্তব পরিস্থিতি অনুকুল বর্ণময় জীবনের প্রশস্ত পথ।

কুম্ভ ঃ সুখাদ্য ভোজন, গৃহসরঞ্জাম ক্রয় ও বাক পটুতায় সম্মান। শিল্পী, কলাকুশলী, ভাস্কর্যের সৃষ্টি আনন্দযজ্ঞে পূর্ণস্থিতি। প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভালোবাসা। সপ্তাহের শেষভাগে বিবাদ-বিসংবাদ-সমালোচনায় বিব্রতভাব।

মীন ঃ পারিপার্শ্বিক ঘটনায় মানসিক চিন্তা। শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, আচার্য ও ধর্মবেত্তাদের প্রতিভার বিকাশ। অর্থ-বিত্ত, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, উদারতা বহুমুখী প্রতিভা ও দক্ষতার মেলবন্ধন মানবিকতার প্রভাব বৃদ্ধি। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সফল প্রয়াস, পরীক্ষার্থীদের অভীষ্ট ও একাধিক সূত্রে উপার্জনের সুযোগ।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য